তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লোক-সাহিত্য ঃ লোকগীতি, লোককথা, লোকনাটক, ছড়া - ছিলকা, প্রবাদ - প্রবচন

ভূমিকা ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে লিখেছেন — "গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে তাহা বিশেষ রূপে, সংকীর্ণ রূপে দেশীয়, স্থানীয়"। কোচবিহারের লোকসাহিত্য সম্পর্কেও একথা সত্য।

কোচবিহারের লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ যেমন বহু শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। তথ্যানুসন্ধানের পর একথা সহজেই বলতে পারি যে প্রাচীন কোচবিহারের জনগোষ্ঠীর সিংহভাগই ছিল সহজ, সরল, অক্ষরজ্ঞানহীন গ্রামবাসী। কৃষি নির্ভর এই সমাজের লোকস্তরেই লোকগীতি, লোককথা, লোকনাট্ক, ছড়া, ছিলকা, ধাঁধাঁ, প্রবাদ - প্রবচন, লোকসঙ্গীত, ব্রতকথা ইত্যাদির জন্ম। এই সৃষ্টিস্রষ্টাহীন মৌখিক সাহিত্য মাত্র। উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী কোচবিহারের লোকজীবনের প্রধান সম্পদই হল তার লোকসাহিত্য। বাংলার লোকসাহিত্যের ভাব বস্তু ও বিষয় বৈচিত্র্য অনুযায়ী কয়েকটি শাখায় ভাগ করা যায় — (ক) লোকগীতি (খ) লোককথা (গ) লোকনাটক (ঘ) ছড়া - ছিলকা, প্রবাদ - প্রবচন ইত্যাদি।

(ক) লোকগীতি ঃ

লোকগীতি বা লোক সঙ্গীত প্রকৃত অর্থে লোকজীবন থেকে উদ্ভূত সঙ্গীত। লোকায়ত জীবনের সুখ, দুঃখ আনন্দ, বেদনা জাগতিক বিভিন্ন প্রত্যাশা পুরণের লক্ষ্যেই এরূপ সঙ্গীতের সৃষ্টি। ইংরেজীতে যাকে বলে Folk Song, যার শব্দ, সুর ও ভাষা ঐতিহ্যের অনুসারী এবং গ্রামীণ সংস্কৃতি নির্ভর, এক কথায় বলা যায় প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে স্নেহ ভালবাসায় তারই সৃষ্ট মানুষ স্মরণাতীত কাল থেকে আপন আপন কীর্তির উজ্জ্বল মহিমার বর্ণচ্ছটায় যে লোক সংস্কৃতির অফুরন্ত স্বর্ণ ভান্ডার গড়ে তুলেছে তারই অন্যতম প্রধান ধারা লোকসঙ্গীত। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে আঞ্চলিক জীবন রসে পুষ্ট বলেই এই গানকে অন্য অর্থে "আঞ্চলিক গীতি"ও বলা যায়।

লোক সঙ্গীতের সৃষ্টিকাল ও তারস্রষ্টার নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নেই। প্রকৃতির আলো বাতাস, পাহাড়, নদী পর্বতের মতই তা জীবন্ত। এই গানের কোন লিখিত রূপ নেই, মৌখিক পরম্পরায় এ গান আজও সর্বত্র প্রবহমান। নদীকেন্দ্রিক, বনভূমি আকীর্ণ জন মানসে যে গীতধারা লালিত হয়ে আসছে তাই কোচবিহারের লোকগীতি। প্রচলিত লোকসঙ্গীত কোচবিহারের লোকায়ত সংস্কৃতিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি করেছে নিজগুণে, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কোচবিহারের প্রচলিত লোকসঙ্গীতকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করেছি (ক) কর্মসঙ্গীত (খ) আনুষ্ঠানিক লোকগীতি।

কর্মসঙ্গীত ঃ লোকগীতি লোকজীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই উৎপন্ন হয়। এতদঞ্চলের শ্রমনির্ভর মানুষের নিত্য সঙ্গী গান। এঁরা হাতে কাজ, মুখে গান নিয়েই তৈরী করেন কর্মসঙ্গীত। কর্মসঙ্গীতে পুরুষ - মহিলা উভয়ের ভূমিকাই সমান। ধানকাটা, রোয়াগারা, ঢেঁকিতে ধান ভানা বা চিড়া কোটার সময় মেয়েরা এরূপ গান করেন। কর্মসঙ্গীতের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল, সাবলীল এবং আঞ্চলিক।

ভাওয়াইয়া ঃ কোচবিহারে প্রচলিত কর্মসঙ্গীত বিভাগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ও ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতধারা হল ভাওয়াইয়া। কোচবিহারের লোকগীতির মূল সুরই হল ভাওয়াইয়া। ভাওয়াইয়ার জনপ্রিয়তার বিস্তার ও চর্চা সমগ্র উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, নিম্ন আসামের গোয়ালপাড়া, বাংলাদেশের রঙপুরে হলেও বিশেষভাবে কোচবিহারে এই সঙ্গীতধারার প্রভাব বেশী। তাই যথার্থই বলা যায় "ভাওয়াইয়ার কোচবিহার বা কোচবিহারের ভাওয়াইয়া।" এর অপর একটি কারণ হল

এই ভাওয়াইয়া গানের যশস্বী শিল্পীরা বেশীরভাগই কোচবিহারের মানুষ।

এই লোকসঙ্গীতের নাম 'ভাওয়াইয়া' কেন হল এসম্পর্কে একাধিক মত প্রচলিত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও তাঁর অনুগামী অনেকের মতে ভাবমূলক গান বলেই এর নাম ভাওয়াইয়া। সংক্ষেপে বলা যায়, যে গানের সুর ও বিষয়বস্তু অন্তরকে দোলা দেয়, ভাবিয়ে তোলে তাই ভাওয়াইয়া। সুরেন বসুনিয়া থেকে আরম্ভ করে আরও অনেক বিদগ্ধ সঙ্গীতসাধকগণ এই মতকে সমর্থন করেছেন। আবার শিবেন্দ্র নারায়ণ মন্ডলের মতে ভাওয়াইয়া হল 'উদাস করা গান'। তাই কেউ বলেন 'বাওয়াইয়া' বা 'বিবাগী' শব্দ থেকে এই গানের নামকরণ হয়েছে। আবার অনেকে মনে করেন 'বাউদিয়া' সম্প্রদায়ের রচিত গান বলে এর নাম 'ভাওয়াইয়া'। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শুরুতে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে বন্যহাতি ও মোষ চরাবার কাজে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ নিযুক্ত হতেন। বনে জঙ্গলে এই বিপজ্জনক কাজ করতে গিয়ে তারা দীর্ঘদিন থাকতেন প্রিয় সঙ্গীহীন। তাই মাহুত ও মৈষালের কণ্ঠে ধ্বনিত হত ভাওয়াইয়া গীত। আবার কেউ কেউ মনে করেন এই অঞ্চল অসংখ্য নদী নালায় পরিপূর্ণ ছিল। ''হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদী বিধৌত অঞ্চলে অবিরত নদী গুলো ভাঙন সৃষ্টি করত। এই ভাঙনের তীরে বাসকরা জন জীবন ছিল অত্যন্ত বেদনা বিধূর। তাই এই ভাঙন শব্দ থেকে 'ভাঙ্নীয়া' বা ভাওয়াইয়া শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।'' [১]

কোচবিহারের লোকভাষায় 'বাও' অর্থে বাতাস বোঝানো হয়। এই বাতাস থেকে ভাওয়াইয়া শব্দের উৎপত্তি বলা যায়। ধূ - ধূ প্রান্তরে রাখালিয়া বাঁশির সুরে এই গানের সুর লোকালয়ের বাইরে থেকে বাতাসে ভর করে ভেসে আসে বলে এর এরূপ নামকরণ। কিন্তু এসব এই লোকসঙ্গীতের নামকরণ সম্পর্কিত সাধারণ যুক্তি হলেও একে সর্বজন গ্রাহ্যও বলা যায় না। গান মাত্রই ভাব নির্ভর। আবার গান শুধু প্রেম ভাবমূলক হলেই তাকে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা যায় না। সে ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। এক সময় লোকালয়ে দোতরা, ব্যানা, সারিন্দা ও বাঁশি বাজিয়ে ভাওয়াইয়া, চটকা ও জাগগান গাওয়া স্থানীয় সামাজিক আইনে নিষিদ্ধ ছিল। বীরভূম, বাঁকুড়ার বাউলদের মত কোচবিহারের বাউদিয়াগণ বিশেষ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নন। অবস্থা বিপাকে বা ঘটনাচক্রেই অনেকে ভবঘুরে হয়ে এই গানকে সঙ্গী করেন। সেই অর্থে তারা বাউদিয়া। আবার বলা যায় কোচবিহারের আঞ্চলিক ভাষায় ''ভাওয়া'' শব্দের অর্থ হল নদী তীরবর্তী বিস্তৃর্ণ ভূমি। রাখালিয়া বালক বা মৈষালবন্ধুগণের কাছে বিস্তীর্ণ চারণভূমি একাধারে যেমন কৃষিক্ষেত্র ছিল তেমনি ছিল পশুপালনের ক্ষেত্র। এ থেকে বলা যায় ''ভাওয়া'' থেকে ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি।

এই গানের উৎস সম্পর্কে গঙ্গাধর দাস ও প্যারীমোহন দাসের অভিমত উল্লেখ করে শ্রীফনী পাল লিখেছেন যে ''চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গল কাব্য এবং নানা প্রকার পালাটিয়াগান থেকে ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি।'' [২]

ব্যক্তিমানুষের চেয়েও এতদঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিমন্ডল ও পরিবেশে কবে থেকে এ সঙ্গীতের শুরু এ সম্পর্কে সঠিক সময় নির্ধারণ করা যায় না। কাঁঠাল কাঠের দোতরাই ভাওয়াইয়া গানের একমাত্র বাহন। এই গানের কলিতেই শোনা যায় - 'মোক করলু জরমের (জনমের) বাউদিয়া।' অর্থাৎ এই দোতরা নামক যন্ত্রটি গায়ককে করে তুলেছে উদাস ও বিবাগী। জলের সঙ্গে মাছের, ফুলের সঙ্গে সৌরভের যেমন সম্পর্ক দোতরার সঙ্গে ভাওয়াইয়া গান একই ভাবে সম্পর্কিত।

''ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি আক্রমণের আগে ঐ দোত্‌রা যন্ত্রটির কথা কেউ বলেনি। মুসলমান সংশ্রবের সঙ্গে এদেশে এসেছে সানাই। এই সময় এসেছে দোতারা যন্ত্রটি দোত্‌রা নাম নিয়ে। প্রচলিত প্রবাদও এই সাক্ষ্য দেয় 'দোত্‌রা হারাম খোর'। দোত্‌রার এই ইতিহাস ভাওয়াইয়ার জন্মলগ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত। দোত্‌রার নামকরণ সম্পর্কে অনেক কষ্টকল্পনা রয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, মইষাল, গাড়ীয়াল, বণিক, নাবিকদের এই ভাওয়াইয়া গানে মুসলিম সংশ্রব একটা বড় সত্য।'' [৩]

কোচবিহারের সামন্ত রাজাদের বিভূতি বৈভবের ইতিহাস দেড়শত বছরের বেশী নয় বলে সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ইংরেজ পন্ডিতদের অনুসন্ধানের সময় পর্যন্ত এখানকার লোকগীতিকে ভাওয়াইয়া নামে অভিহিত করা হয়। গ্রিয়ারসন সাহেবের মতে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকগীতি রাজবংশী ভাষার গান। যেমন —

(১) প্রাণ সাধুরে
যদি যান সাধু পরবাস
না করেন সাধু পরার আশ্
আপন হাতে সাধু —
আধিয়া খান ভাতোরে।" (কোচবিহার জেলা)

(২) পর্থম যৌবনের কালে না হৈল মোর বিয়া
আর কতকাল রহিম ঘরে একাকিনী হয়া
রে বিধি নিদয়া। (জলপাইগুড়ি জেলা)" [৪]

গ্রিয়ারসন সাহেব এগানকে যদিও ভাওয়াইয়া নাম দেন নি তবু বলতে পারি এগুলো ভাওয়াইয়ার আদিরূপ।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, অনাদিকাল থেকে এতদঞ্চলে মৌখিক পরম্পরায় প্রচলিত রাখালিয়া, মৈষালগীতই পরবর্তীকালে রাখালিয়াগান, দোতরাগান, মৈষালি বা মৈষালবন্ধুরগান, বাউদিয়া বা ভাঙ্নিয়া ইত্যাদি লোকগীতি, ভাওয়াইয়া নামে অভিহিত হয়। মৈষালী বা রাখালিয়া লোকসঙ্গীতই ভাওয়াইয়া গানের আদিরূপ।

নদী প্রধান কোচবিহারের জনজীবন ও বসতি ছিল অনিশ্চিত। গহন অরণ্যের নির্জন ভয়াল পরিবেশের মধ্যে প্রবাহিত একাধিক নদনদী। এমন পরিবেশে মানুষের সঙ্গী ছিল এই গান। তাই নদীকে নিয়ে গান বাঁধা হত এখানে। যেমন—

"নদী না যাইওরে বৈদো
নদীর ঘোলারে ঘোলারে পানি।"

ভাওয়াইয়া গানের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হল প্রেম, লোকশিক্ষা, দেহতত্ত্ব অনেক ক্ষেত্রেই গানের বিষয় হলেও এই গান মূলত প্রেমের গান। আবার একে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের গান বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই গানের প্রেমিক প্রবর কোথাও রাখালিয়া বালক, কোথাও মৈষালবন্ধু, কোথাও বাউদিয়া, কোথাও বৈদো বা কালিয়া। বাঁশি নয়, দোতরাই এর মূল বাহন। এ গানের পরকীয়া প্রেমের অভিব্যক্তি ও তীব্রতা, রায়ডাক, তোর্ষার মতই খরস্রোতা। পরকীয়া প্রেমের প্রাধান্য এতদঞ্চলের সমাজবিন্যাসকেই প্রতিফলিত করে। তা বলে স্বকীয়া প্রেমের গভীরতাও কম নয়। এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় সঙ্গীতের নিদর্শন আমরা পাই আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে, কথায় ও সুরে —

"ওকি ও বন্ধু কাজল ভোমরা রে
কোন দিন আসিবেন বন্ধু
কয়া যাও কয়া যাও রে।"

বিরহ এই ধারার লোকসঙ্গীতের অন্যতম বিষয়। মূলত প্রেম, প্রীতি, দৈনন্দিন সংসার জীবন নির্ভর লোকসঙ্গীতের এই ধারায় তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনা গৌণ। বিষয়বস্তু লৌকিক প্রেম হয়েও প্রকাশভঙ্গীতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই গান।

গানের মাধ্যমে সুখ - দুঃখ, হাসি - কান্না, ব্যাথা-বেদনা ও মিলন-বিরহ প্রকাশ পায়। আমরা যথার্থই বলতে পারি কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গান প্রবাসের আত্মীয় স্বজনের বিরহ বেদনার প্রকাশ ঘটায়। আপন জনকে দূরে রেখে জীবন জীবিকার স্বার্থে অনেকে যখন গরু মহিষের রক্ষক হয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভাওয়ায় কাটায় তখন তাদের নিত্যদিনের কথাই ভাওয়াইয়া গানে মূর্ত হয়ে ওঠে আপন জনের কণ্ঠে —

"ওরে তখনে না কইচঙ মইষালরে
মইষাল না যান গোয়ালপাড়া
ওরে কাড়িয়া লবে হাতের বাঁশি
ছিড়িয়া গলার মালা রে।"
(প্রচলিত কথায় ও সুরে নায়েব আলী গীত)

ভাওয়াইয়া নামক এই প্রেম সঙ্গীতের নায়ক মহিষ রক্ষক মৈষালবন্ধু হওয়ায় একে মৈষালবন্ধুর গানও বলা হয়।

পালাগানের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য শ্রোতাদের সাময়িক আনন্দ দানের জন্য এক ধরনের 'খোসা' গান ব্যবহৃত হয় এখানে। যেমন — 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে' - এই গানটির ব্যবহার দেখা যায় সতী বেহুলা পালায় গোদা যখন বর্শি দিয়ে মাছ ধরছে। প্রকৃতপক্ষে ভাওয়াইয়া গান তার সুর ও ছন্দের নিজস্বগুণেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

কোচবিহারের ভাওয়াইয়াগানে আঞ্চলিক উচ্চারণ রীতি বিশেভাবে লক্ষণীয়। এই গান গলার স্বরভাঙা উচ্চারণ, নদীনির্ভরতা, বনভূমি অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গের নৈসর্গিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ ফল বলে আমরা মনে করি। "প্রান্ত উত্তরবঙ্গের ভূ প্রকৃতি এমনই যে নদীগুলি অপ্রশস্ত ও অগভীর হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে হয় খুব স্রোতা। সে কারণেই নদীগুলি ঘন ঘন হঠাৎ বাঁক নেয়। সেই Abruptness ই ধরা পড়ে গলা ভাঙায়।" [৫]

আঞ্চলিক লোকগীতির সুর ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল এর অন্তর্নিহিত সুরমাধুর্য উপলব্ধি করতে পারেন আঞ্চলিক মানুষরাই। যেমন কোন বিশেষ অঞ্চলের গায়কের কণ্ঠেই বিশেষ আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের অর্থ ধরা দেয় সম্পূর্ণভাবে।

"আঞ্চলিক গানের সুর জন্মগত অধিকার সূত্রে মানুষ লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে inherited quality বলে ইহা তাহাই, ইহা বাহির হইতে আয়ত্ত করা গেলেও জন্মগত অধিকার সূত্রে ইহা যাহারা লাভ করে তাহাদের মত ইহাতে আর কাহারও অধিকার জন্মিতে পারে না।" [৬]

ভাওয়াইয়াগানকে আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্যের বিচারে যে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, সেটি হল — চট্‌কা ও দরিয়া। ভাওয়াইয়া গানের চটুলরূপই হল এই চট্‌কা। নৃত্যের আবেগে, সুরে ও তালে চট্‌কা গান হয়ে ওঠে লাস্যময়ী। তা সত্ত্বেও এ গানে জীবনের গভীর সংবেদন মূর্ত হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন জীবনে চোখে দেখা লঘু চপল বিষয়ই এই গানে শ্রুতিমধুর হয়ে ধরা দেয়। দ্রুত তালে আবদ্ধ মনোরঞ্জনকারী এই চট্‌কা গান মূলত লঘু বিষয়, তিন তিন ছয় মাত্রার তালে গাওয়া হয়। যেমন —

"প্রেম জানে না রসিক কালাচান
ঝুরিয়া থাকে মন . . . . . ।"

কোচবিহার পার্শ্ববর্তী জলপাইগুড়ি জেলায় ভাওয়াইয়ার এই চট্‌কা আঙ্গিকটি "ফাক্‌সালি" এবং "খ্যাচেরা" নামে পরিচিত। হাসি, রঙ্গ, ব্যাঙ্গ, বিদ্রূপ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি জীবনের বিচিত্র দিকগুলো দ্রুত ছন্দে হালকা সুরে এবং লঘু তালে উজ্জ্বল করে তোলা হয় চট্‌কার নামান্তরে এই 'ফাক্‌সালি' গানে। যেমন —

"ও তুই কিসোত গোসা হলুরে
নাল বাজারের চ্যাংড়া বন্ধুরে।"
অথবা
"দাড়ি পাল্লা হাতোত করি পাইকার বেড়ায় টারি টারি
কোন বাড়ীতে কোষ্টা ব্যাচাইবে"

দরিয়া চার চার আট মাত্রার চালে গাওয়া হয়। দরিয়ার গতি দীর্ঘ এবং গভীর। মনকে উদাস করে তোলে। এক কথায় বিলম্বিত লয়ের সঙ্গীত। যেমন —

"ও কন্যারে, কন্যা তোর কন্যার পীরিতের আশে
বাপো ভাই কন্যা ছাড়িলাম দ্যাশে রে।"
অথবা
"ওরে, ওরে মোর কাঠোল খুটার দোতরা।"

ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীতের দুটি মূল বিভাগ - চট্‌কা ও দরিয়া হলেও এই গানের বিষয়বস্তু র বিভিন্নতা, সুর ও ছন্দের বৈচিত্র্য অনুযায়ী এর মূল সুর প্রধানত ছয়টি ভাগে বিভক্ত। যেমন —

(১) চিতান ভাওয়াইয়া ঃ বিচ্ছেদ বেদনায় নারী মন ভেঙ্গে পরলে এই গানের আশ্রয় নেয়। এর বৈশিষ্ট্য হল উচ্চগ্রাম থেকে ক্রমে নিম্ন গ্রামে অবতরণ। পরকীয়া প্রেমের মাধুর্য এই গানের প্রাণসম্পদ। যেমন —

"ওকি একবার আসিয়া সোনার চাঁদ মোর, যাও দেখিয়ারে।
অদিয়া অদিয়া যানরে বন্ধু ডারায় (১) না হন পার
ওরে থাউক বোল তোর দিবার থুবার দেখায় পাওয়া ভার রে।"

(২) ক্ষীরল ভাওয়াইয়া ঃ এই শ্রেণীর গানে দোতরা বাজাবার একটি বিশেষ পদ্ধতি বা ধরন আছে। এ ধরনকে ক্ষীরল ডাং (Stroke) বলে। বিরহের প্রতীক এই গানে সাধারণত কিছুটা নিম্নগ্রামে আরম্ভ হয়ে উচ্চ গ্রামে যায়। যশস্বী লোকসঙ্গীত শিল্পী আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে এই গানে শোনা যায় —

পু - "কোনটে থাকে কন্যা তোমার স্বামী
কোনটে দেখা তার পাব আমি
আজি কও হে কন্যা সে কথা তুমি আমারে।

না - উজান গেইচে বন্ধু বাণিজ্যের আশে (৩)
এলাও টারত (৪) বন্ধুরে গামছা হাসে
আজি সকল কথা বন্ধু কই ও তাহার আগেহে।"

(৩) দরিয়া বা দীঘল নাসা ভাওয়াইয়া ঃ এই গান দীর্ঘ প্রসারিত দম সাপেক্ষ। সুরে দীর্ঘশ্বাসের প্রয়োগ দেখা যায়। ভাওয়াইয়ার এই বিভাগের এতদঞ্চলের জনপ্রিয় গান হল —

"ওকি গাড়িয়াল (১) ভাই
কত রব আমি পন্থের দিকে চায়া রে।
যেদিন গাড়িয়াল উজান যায়
নারির মন মোর ঝুরিয়া রয় রে।"

(৪) গড়ান ভাওয়াইয়া ঃ বিরহ বেদনা কাতর নারীর ধূলায় গড়াগড়ি যাওয়ার অবস্থা। অর্থাৎ যে গান শুনে উপলব্ধি হওয়া স্বাভাবিক যে ব্যথাতুরা নারী ধূলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, এক কথায় এমন সুরের গান।

"কত পাষান বান্ধাইছ পতি মনেতে / দুঃখের দিনে রইলেন পতিধন বৈদ্যাসে।"

(৫) করুণ রসের ভাওয়াইয়া ঃ এ গানে করুণ রসের প্রাধান্য থাকে। ভাওয়াইয়া গানের যে পর্যায়ে সামাজিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় - তাদের অন্যতম চিটুল / চিটুক বিদুয়া। স্বামীর মৃত্যুর পর বিবাহিতা নারীর অকাল বৈধব্য জীবনের যন্ত্রণা ও চরম শোকের ছবি ফুটে ওঠে, তাই এখানে চিটুর বিদুয়া নামেও পরিচিত এই গান। এ গানের প্রচলিত একটি রূপ —

"নদীর পাড়ের কুরুয়ারে মোর জামের গাছের গুরা
কোড়ারে মুই কান্দোং চিটুল বিদুয়া হয়্যা।"

(৬) মৈষালী বা সোয়ারী চালের ভাওয়াইয়া ঃ বাড়ি ঘর ছেড়ে দূর দেশে মহিষ চারণের জন্য থাকাকালীন যখন বাড়ির কথা মনে পড়ে, তখন চলমান মহিষের সওয়ার হয়ে মৈষালবন্ধু যে গান করেন, তাই মইষালবন্ধুর গান। এই গানের চাল অন্যান্য গানের থেকে ভিন্ন। এই গান গাইবার সময় মনে হয় যেন গায়ক কোনকিছুর সওয়ার হয়ে চলছে এবং চলার ছন্দ গানের ছন্দে প্রকাশ পায়। এই চালকে সোয়ারী চাল বা মৈষালী চাল বলে। অনেক সময় মৈষালের বিরহেও এই গান করেন তার পত্নী। যেমন —

"মৈষ চড়ান মোর মৈষালবন্ধুরে
বন্ধু কোনবা চড়ের মাঝে
এলা কেনে ঘন্টির বাজন
না শোনোঙ মুই কানে মৈষালরে।"

ভাওয়ার গান ভাওয়াইয়ায় পুরুষ প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও নারীর বিরহ বেদনা এ গানে প্রকাশ পায় নারীর জবানীতে পুরুষ কণ্ঠে। আবার পরনারীতে আসক্ত স্বামীর ব্যবহারে ব্যথিতা নারী যা গেয়ে ওঠেন, তা ভাওয়াইয়া গানে হৃদয় স্পর্শী কবিতায় রূপ লাভ করে —

"মন সজনী কার কাছে কব দুঃখের কথা
কিসের মোর রান্দোন, কিসের মোর বারন
কিসের মোর হলদিয়া বাটা।"

ভাওয়াইয়া গানের আর একটি দিক হল — দেহতত্ত্বের গান। মানুষ তার নিজের রসসিক্ত ভক্তিপূর্ণ মনকে অদৃশ্য দেবতার কাছে নিবেদন করে এক ধরনের আধ্যাত্মিক গান ভাওয়াইয়ার সুরে গেয়ে থাকেন। এতদঞ্চলে মনঃশিক্ষা এবং তুক্ষা নামে যা পরিচিত। যেমন — মেখলিগঞ্জ মহকুমার লোক শিল্পী সোমারু বর্মনের কণ্ঠে শুনি —

"ভাবের বৈরাগী তুই ভাবতে মজালু
তোর প্রেমে মজিয়া শোক সাগরে ভাসালু
ও বৈরাগী নামটি ভালো, কেনে বা তুই বৈরাগী হলু
হরিনাম ছাড়িয়া এলা তুই প্রেমেতে মজালু।"

ভাওয়াইয়া গানে সমকালীন আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বাস্তব ঘটনার প্রতিফলন ঘটে। যেমন — বন্যা, ভাঙন, দুর্মূল্যের বাজারে কন্ট্রোলের কাপড় নিয়ে চোরাকারবারীর মত ঘটনাও উল্লিখিত হয়। একটি গানে দেখা যায় —

"ও ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে
চতুর্দিকে জ্বলে সরুজবাতি

North Bengal University
Library
Raja Rammohunpur

151896
2 9 MAY 2003

তোমার ক্যানে বল আন্ধার রাতিরে।"

এতদঞ্চলে প্রচলিত সকল আঙ্গিকের লোকগীতির সর্বজনগ্রাহ্যতা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার মন জয় করেছে। ভাওয়াইয়া গানের জনপ্রিয়তা আজ বাংলার লোকসঙ্গীতের অন্যতম অংশীদার। এ গান যথার্থই কোচবিহারের লোকগীতির ভিত্তি। শহুরে, সুশিক্ষিত, শিষ্টজনের সুনজরে পরে এ গান আজ কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির বহুমান ধারায় পর্যবসিত।

এই গানের প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে যারা নিরলস অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে সুরেন্দ্র নাথ বসুনিয়া, আব্বাসউদ্দীন আহমেদ, শৈলেন রায়, শিবেন্দ্র নারায়ণ মন্ডল, জীবন মৈত্র, নায়েব আলী টেপু, প্যারীমোহন দাস প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যায় কোচবিহারের ভাবের গান ভাওয়াইয়ার সঙ্গে যোগ বেশী। লোকসঙ্গীতের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়েও এ গান আজ নিজস্ব গুণে, সুর ও ছন্দের মাধুর্যে কোচবিহারের আঞ্চলিক সীমাকে অতিক্রম করেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় এর সুরের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আজ আধুনিকতার ছোঁয়ায় হোঁচট খাচ্ছে। সময়ের পরিবর্তনে ভাওয়াইয়ার সুরও পরিবর্তিত হচ্ছে। সরকারী সৌজন্যে ভাওয়াইয়াগানের পুনরুজ্জীবনে ও সংরক্ষণে এক নতুন দিক সৃষ্টি হয়েছে। তোর্ষা - রায়ডাক, গদাধরের জল বেয়ে সাউদ সওদাগরের আনাগোনা আজ আর নেই। রাখালিয়া বালক বা মৈষাল বন্ধুরা দিনান্তের গোধূলিতে আর পেন্টি (ছোট লাঠি) হাতে গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফেরে না। তবু লোকসঙ্গীতের বহমান এই ধারা ও তার ঐতিহ্য আজও তোর্ষা, কালজানি, রায়ডাক, গদাধরের স্রোতের মতই প্রবহমান। ভাওয়াইয়া ছাড়াও জেলায় প্রচলিত রয়েছে আরও অনেক কর্মসঙ্গীত। যার অন্যতম সারিগান —

সারিগান ঃ নদীমাতৃক কোচবিহারে নদীকে ভিত্তি করে যাদের জীবিকার আশ্রয়, এক কথায় মাঝি-মাল্লাদের মধ্যে সারিগানের প্রচলন বেশি। যদিও এই গানের মূল উপলক্ষ্য থাকে নৌকাবাইচ। জেলার সর্বত্রই নৌকাবাইচের প্রচলন আছে একথা বলা যায় না। অনেকে মনে করেন নৌকাবাইচের উৎস কল্পনায় গাজীপীরের কেরামতি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের মত কোচবিহারেও আনুষ্ঠানিক লোকক্রীড়া হিসেবে প্রতিযোগিতামূলক নৌকাবাইচের আগে এবং পরে প্রতিযোগীরা নাচের মাধ্যমেই যেমন এই সারিগান করেন তেমনি নৌকা চলাকালীনও এই গান করেন। নৌকার দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে বসে দাঁড়বাহকগণ যখন দাঁড় টানেন, তখন নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে সারিগানের মূল বা দোয়ারী প্রথম গান ধরেন।

এতদঞ্চলে বিশেষকরে কালজানি নদীতেই নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান ছাড়াও স্বতন্ত্র দিনে এই সারিগান ভিত্তিক নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে যখন খাল - বিল এমনকি নদীতে যখন তুলনামূলকভাবে জল কম থাকে তখনই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নৌকাবাইচকে উপলক্ষ্য করে এই গানের আয়োজন হয়। সারিগানের বিষয়ে অনেকক্ষেত্রে যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেম থাকে, তেমনি থাকে লৌকিক প্রেম। তাই সারিগানে দেখা যায় প্রেমিকা তার প্রেমিক-কে উদ্দেশ্য করে বলেছে —

"দক্ষিণা হাওয়ায় প্রাণ বাঁচে না
সোনার বন্ধু নাই ঘরে
ঢালুয়া খোপা উড়াল বাতাসে।" [৭]

বলরামপুর গ্রামের লোকশিল্পীগণ চিলাখানা বন্দর সংলগ্ন কালজানি ব্রিজের দক্ষিণ পার্শ্বে কালজানি নদীতে নৌকাবাইচের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এরূপ একটি সারিগান গেয়ে শোনান।

"অল্প বয়সে খইস্যা পড়ল রাজার গলার মতি হার
বসন্ত কালরে আমার ২
যখন ও জন্মিল কন্যা বর্ণ রাজার ঘরেরে

বসন্ত কালরে আমার
নয় না বছরের কন্যা দশ নাহি পুরে রে
বসন্ত কালরে আমার
নালিশ করিল কন্যা বাপেরও হুজুরে রে
বসন্ত কালরে আমার।" [৮]

সারিগানের সঙ্গে প্রতিযোগিগণ সারি নাচও প্রদর্শন করেন। "সারিগানের বিষয় একাধিক। রাধা - কৃষ্ণ, হরগৌরী, নিমাই সম্পর্কিত গান, লৌকিক নরনারীর প্রেমাত্মক গান, পরস্পর আক্রমণাত্মক গান গাওয়া হয় বেশী।" [৯]

বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে মনসা ভাসানের দিন এই গানের প্রচলন থাকলেও কোচবিহারে হিন্দু সমাজে আশ্বিনের শুক্লা দশমী - তিথির পর নৌকাবাইচকে উপলক্ষ্য করে এই গানের প্রচলন বেশী।

ছাঁদ পেটানো গান ঃ কোচবিহার জেলায় ছাঁদ পেটানোর সময় রাজমিস্ত্রি শ্রমিকগণ কর্মসঙ্গীত হিসেবে একরকম গান করে থাকেন। যার বেশীরভাগ সুরই ভাওয়াইয়া এবং ভাটিয়ালী। লোকসঙ্গীতের আঙ্গিক বিচারে এগুলি কখনও মনঃশিক্ষা, আধ্যাত্মিক, দেহতত্ত্ব ও প্রেমমূলক। একটি ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া গান এতদঞ্চলে রোয়াগাড়া, ছাঁদপেটানো, পাট কাটার সময় শ্রমজীবী সম্প্রদায় তাদের শ্রমকে লাঘব করার জন্য গেয়ে থাকেন।

"ওকি পতিধন প্রাণ বাঁচেনা যৈবন জ্বালায় মরি
আকাশেতে নাইরে চন্দ্র কি করে তার তারা
— — — — — — — — — — — —
যে নারীর সোয়ামী নাইরে দিনে আন্ধিয়ারা।"

লোক সঙ্গীতের শ্রেণী বিচারে ছাদ পেটানোর গান অন্যতম কর্মসঙ্গীত। সেই হেতু ধান কাটার গান, পাট কাটার গান, ধান ভানার গান, বোনার গান, তাঁত চালানোর গান ইত্যাদির মত ছাঁদ পেটানোর গানকেও সারিগান বলা যায়। লোকায়ত কর্ম জীবনে গ্রামীণ শ্রমিকগণ সারিবদ্ধভাবে গান গুলি করে বলে একে সারিগান বলা হয়।

প্রসঙ্গত বলা যায় সারিগানের পাশাপাশি ভাটিয়ালী গানের প্রচলনও আছে কোচবিহারে। তিস্তা, তোর্ষা, গদাধর, কালজানি নদী পথে ভাটি দেশের (বাংলাদেশ) বাণিজ্য উপলক্ষ্যে নৌকার মাঝি মাল্লাদের সঙ্গে ভাটিয়ালী গানের আগমন ঘটে এতদঞ্চলে।

মাছ ধরার গান ঃ উত্তরবঙ্গের আদিম জনজাতির অন্যতম রাভা জনজাতি। যাদের জীবনাচরণ, ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি উত্তরবঙ্গ তথা নিম্ন আসামের লোক সংস্কৃতির এক বিরল দৃষ্টান্ত। এই জনজাতির জীবন চর্চায় নৃত্যগীতের স্থান অতি নিবিড়। রাভা ভাষায় নৃত্যকে বলা হয় "বসিনী" (Basini) এবং গীতকে বলা হয় "চায়" (Chai)। এই জনজাতির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনবৃত্তের প্রতিটি পরতে পরতে নৃত্য ও গীতের প্রচলন আছে। সাধারণত নদী বা জলাশয়ে মাছ ধরার সময় নারী পুরুষ উভয়েই কোমরে খলুই বেঁধে, হাতে জাকই নিয়ে নৃত্যের তালে তালে নিম্নোদ্ধৃত গীতটি করেন। যাকে উক্ত জন সমাজের নিজস্ব ভাষায় বলা হয় 'নাকচেংবেনি'। যেমন —

'ফালা কাটাঙ্গি পালাউ আনাও
ফালা কাটাঙ্গি পালাউ
শিঙ্গি মারিঙ্গি দুকু আনাও
শিঙ্গি মারিঙ্গি দুকু

উ - দুকু মইন উ পালাউ মইন
চিনা জোরা হাসামায় নাকচেংরেতিয়া
আনাও না রেতিয়া
নাং পালাউ নো আনাও।" [১০]

রাভা জনজাতির 'হুর' পূজার যে গান করা হয় তাকে বলা হয় 'হুর তাঙি'। আবার বৈশাখ মাসে এদের প্রধান দেবী 'আমায়জু' পূজা উপলক্ষ্যেযে নৃত্য গীতের অনুষ্ঠান হয় তাকে বলা হয় 'কা - তাঙি'। কোচবিহারের রাজবংশী সমাজেও মাছ ধরার নিমিত্তে অনেক গান প্রচলিত আছে। যেমন —

"মাছ মারে মাছুয়া ভাইরে ছেকিয়া ফেলায় পানি
আমার মাছুয়া মাছ মারিছে চন্দনা পরুয়া
মাছ মারে মাছুয়া ভাইরে
ইলশা শামলাং কইহে।"

হাতি পোষ মানানোর গান ঃ আসামের গোয়াল পাড়া বিশেষ করে গৌরীপুর অঞ্চলে গান দিয়ে মানুষের আওয়াজের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় হাতিকে এবং প্রশিক্ষণ শুরুর সময় আল্লা রসুলের যে গান গাওয়া হয় তা হল —

"আল্লা আল্লা বলরে ভাই হায় আল্লা রসুল
কোন মহলের হাতিরে ভাই হায় আল্লা রসুল।"

আবার হাতির মাহুত ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনী ভিত্তিক এক ধরনের গান প্রচলিত আছে যাকে বলা হয় 'মাহুত বন্ধুর গান'। যেমন —

"গদাধরের পাড়ে পাড়ে রে
মোর মাহুত চড়ায় হাতি
কি মায়া নাগাইলেন মাহুতরে
তোর গলায় রসের কাঠি।"

অরণ্য অধ্যুষিত কোচবিহারের অনেক অঞ্চলে এই গান একদা বহুল প্রচলিত থাকলেও আজ তা বিলুপ্তির পথে। দূরদর্শন ও ভিডিওর মত আধুনিক বিনোদনের প্রচার মাধ্যমের দাপাদাপিতে জেলার গ্রামীণ সংস্কৃতির বহমান এই ধারার যাত্রাগান, কবিগান, পালাগান এবং ভাওয়াইয়ার মত লোকগীতিআজ বিলুপ্তির পথে। তা সত্ত্বেও বেশ কিছু প্রবীণ লোকশিল্পী লোক সংস্কৃতির এই ধারাকে কখনও ব্যক্তিগতভাবে, কখনও সমষ্টিগতভাবে আঁকড়ে ধরে আছেন।

আনুষ্ঠানিক লোকগীতি ঃ কোচবিহারের লোকগীতির একটি বড় অংশ এর আনুষ্ঠানিক লোকগীতি। এ প্রসঙ্গে বলা যায় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের বিষহরি পূজা ও পালা, ষাইটল পূজার গান, কাতি পূজার গান, পদ্মা পুরাণকে নিয়ে এখানে পালা গান নামেও প্রচলিত। আসামে এই গানকে বলা হয় 'বাঁশীপুরাণ' গান।

আবার কোচবিহারের লোকনৃত্য ও লোকগীতি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। কোচবিহারের জনজীবনে অলিখিত সাহিত্যের রসমাধুর্যের প্রকাশ পায় এই লোক সঙ্গীতে। গ্রামীণ লোকজীবন এই সকল লোকসঙ্গীতের মূর্ছনায় কর্মজীবনে এক নূতন প্রেরণা লাভ করে।

কোচবিহারের লোকসঙ্গীতের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল - এর উত্তরসাধকগণ অনেক ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমিক। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে আজও অনেক লোকশিল্পী আছেন যারা পুরুষানুক্রমে এই গান গেয়ে চলেছেন। এর বাস্তবতা দেখা যায় আনুষ্ঠানিক গানের মারেয়া মারেয়ানীদের মাধ্যমে। হলদিবাড়ীর তিস্তাবুড়ি ব্রতের মারেয়ানী পবনেশ্বরী রায়, নাটাবাড়ীর বিষহরি ও যাইটল পূজার মারেয়ানী খুকি নম দাস, দিনহাটার পুটিমারি গ্রামের ফুলতি বর্মন, মাঘপালা গ্রামের নেন্দা বর্মন আজও বংশানুক্রমিকভাবে এই গান গেয়ে চলেছেন।

কোচবিহারের কুষাণ - দোতরা পালা নামক লোকনাটকেও এতদঞ্চলের স্থানীয় ভাষায় গানের প্রচলন আছে, যাকে বলা হয় 'পালাগান'।

বিয়ের গান ঃ প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়েরই লোক সঙ্গীতের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ বিয়ের গান বা গীত। সমাজ বিবর্তনের ধারায় শিক্ষিত জনমন থেকে লোকসঙ্গীতের মূল্যবান এই ধারা আজ লুপ্ত প্রায়। লোকজীবনের প্রাচীন কতগুলি রূপ এই গীতের মধ্যে দেখা যায়। পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই এই গান বা গীতের কদর। বিয়ে নামক ব্যবহারিক প্রয়োজন ফুরোলেই গীতগুলি প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

লোকসঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিকতা, বিশেষ অঞ্চলের জীবন, সংস্কৃতি, পূজা পার্বণ ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে লোকসঙ্গীতের আদল। বিশেষ অঞ্চলের সংস্কারকে অবলম্বন করেই আবার অনুষ্ঠিত হয় পূজার গান, ব্রতের গান, বিয়ের গান ইত্যাদি। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের বিয়ের গানের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের বিয়ের গানের একটি পার্থক্য আছে। অন্যান্য অঞ্চলের বিয়ের গানে বিশেষত, দক্ষিণবঙ্গে বর - কনে প্রত্যক্ষ ও বাস্তবে উল্লেখ হয় না। তারা রাধা - কৃষ্ণ বা রাম সীতা হয়ে দেখা দেয়। কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী সমাজের বিয়ের গানে বর - কনে তাদের নিজস্ব নামেই উল্লিখিত হয়। কিন্তু মুসলিম সমাজে মেয়েলী বিয়ের গানে মানবতাই বড় হয়ে দেখা যায়। আর লোক সঙ্গীত হিসেবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে মুসলিম বিয়ের গান বেশী আদৃত।

জেলার পাঁচটি মহকুমার ব্লক ও গ্রামপঞ্চায়েত ভিত্তিক ক্ষেত্রসমীক্ষায় কোচবিহারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম নিরপেক্ষ বিয়ের গানগুলির মধ্যে আমরা কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি — (ক) বিয়ের বিভিন্ন লোকাচার ভিত্তিক অনুষ্ঠানকে নিয়ে গান করা হয়। (খ) বিয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর ও কনেকে কেন্দ্র করে হাসি - ঠাট্টা ও রঙ্গ - ব্যঙ্গ মূলক গান করা হয়। (গ) বর ও কনের বাড়িতে তাদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করেও গান করা হয়। (ঘ) নবদম্পতিকে উদ্দেশ্যকরে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের শুভকামনা করেও অনেক গানের প্রচলন আছে।

স্থানীয় রাজবংশী সমাজে বিয়ের দিন বর কনের বাড়িতে আসার মুহূর্তে যখন কন্যা ও কন্যার বাড়ির মহিলাগণ কান্নাকাটি করেন তখন কনের বাড়ির বৈরাতিগণ বরকে বরণ করার নিমিত্তে যে গান করেন তার একটি নিদর্শন পাই মেখলিগঞ্জ মহকুমার নিজতরফ গ্রামের মালতি বর্মনের কণ্ঠে —

"ও ভুট ভুটির মাও (উলু / জোকার)
কইন্যা কাইন্দ না, কাইন্দ না, কাইন্দ না ঘরে (২)
বিয়ার গাড়ী ওই বুঝি আইসে" [১১]

স্থানীয় রাজবংশী সমাজের লোকাচারের মত জেলার মুসলিম সমাজে লোকাচার ও পার্বণের অন্যতম উপাদানই হল এই গান। শরিয়তে, বিয়েতে গানের অনুমতি না থাকলেও কোচবিহারে জেলার বহু অঞ্চলে স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়েতে গানের প্রচলন আছে। জেলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম এই সম্পদ আজ বিলুপ্তির পথে। তুফানগঞ্জ মহকুমার দেওচড়াই অঞ্চলের কেতুমন বিবি ও নচিমন বিবি, চর বালাভূতের জরিনা বিবি, সাহিনা বিবি, জাহানারা বেগম, হামিদা বিবি, ঝনকা

বিবি, বাঁশরাজা গ্রামের হালি বিবি, রহিমা বিবি, নেসবান বিবির কণ্ঠে আজও বেঁচে আছে কঠিন সংযম ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই গান। এই রকম একটি গান নিম্নরূপ —

"খোলা হাটের মাঝে রে জয়মালা টানাইছে রে
নাল ময়না তোরে কারণে
সুন্দর ময়না তোরে কারণে
তোর বাবা জবাব দিচে ভরা সভার মাঝেরে।" [১২]

জাগ গান ঃ কোচবিহারের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মদনকাম দেব বা বাঁশ পূজা উপলক্ষ্যে জাগগানের প্রচলন আছে। সারা রাত জেগে এই গান গাওয়া হয় বলে এই গান 'জাগ গান' নামে পরিচিত। মতান্তরে এই গানের দ্বারা কামকে জাগ্রত করা হয় বলে এই গানের নাম 'জাগ গান' হয়েছে। মূল গায়ক প্রথমে গান ধরলে দোহারগণ পরবর্তীতে ধুয়া দেন। আখ্যান মূলক এই গানে মদনকামদেবের জন্মকথা, বাঁশের জন্মকথা, নাড়ু সিজ্জন প্রভৃতি নামে গান গাওয়া হয়। এছাড়াও এই গানে সত্যপীর, চৈতন্যলীলা, সমসাময়িক আঞ্চলিক প্রেমলীলাও এই গানের বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা জাগ গানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে প্রথম জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। অবিভক্ত বাংলার রঙপুর জেলার প্রতিবাদী কবি রতিরাম দাস ছিলেন এই গানের রচয়িতা এবং গায়ক। কোচবিহারের মদনকাম, বাঁশ পূজার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই জাগগান। কবি রতি রাম দাস রচিত একটি জাগ গানে ইংরেজ শাসিত উত্তরবঙ্গের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিচয় পাই। বিশেষকরে তৎকালীন ইজারাদার দেবী সিংহ ফতেপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে অত্যাচার চালায় তারই নিখুঁত বর্ণনা। পাওয়া যায় এই গানটিতে —

"কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবী সিং
সে সময় মুল্লুকেতে হৈল বার টিং
কত যে খাজনা পাইবে তার নেকা নাই
যত পারে তত নেয় আরো বলে চাই।" [১৩]

কানাই ধামালী বা লীলা জাগ নামেও একধরনের পাড়া ভিত্তিক জাগগানের প্রচলন আছে এখানে। ভাওয়াইয়া লোক সঙ্গীতের অন্যতম সম্পদ এই 'কানাই ধামালী'। এ গান মূলত আখ্যায়িকা মূলক লোকগীতি।

সত্যপীরের গান ঃ মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের বিশেষ করে সত্যপীর, গাজীপীর ও তোর্ষা পীর প্রমুখের মাহাত্ম্য প্রচার করে একধরনের গান প্রচলিত আছে যা সত্যপীরের গান নামে পরিচিত। এ গান হিন্দু - মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত আছে। ক্ষেত্রানুসন্ধানে জেলার হলদিবাড়ী ব্লকের পৌর এলাকার ফজলুল হক মহাশয় গুরুশিষ্যের কথোপকথনের ভঙ্গিতে সত্যপীরের এক গান গেয়ে শোনান —

শিষ্য — "কোন ফকিরের বেটা তুমি,
কোন ফকিরের নাতি?
আসমান হইল কয়তবক,
জমিন কয় রত্তি?

ফকির — মন ফকিরের বেটা আমি
তন ফকিরের নাতি
আসমান হইল সাত তবক (স্তর)
জমিন ছয় রত্তি।"

অন্যান্য ঃ

গোপীচন্দ্র - ময়নামতীর গান ঃ কোচবিহার তথা অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের প্রাচীন মৌখিক সাহিত্যের চমকপ্রদ নিদর্শন 'গোপীচন্দ্রের গান'। কোথাও কোথাও একে ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের গানও বলা হয়। নানা কারণেই গোপীচন্দ্রের গান প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে এখানে। সার জর্জ গ্রীয়ারসন ময়নামতীর গান সংগ্রহ করে "মানিকচন্দ্র রাজার গান" নামে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রথম প্রকাশ করেন ১৮৭৮ সালে। গোপীচন্দ্রের গীত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে ভবানী দাস রচিত 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' এবং সুকুরমামুদ রচিত 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' গোপীচন্দ্রের গানের সঙ্গে একযোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

গোপীচন্দ্র ও তার মা ময়নামতীকে কেন্দ্র করে এক মহাকাব্যধর্মী আখ্যান গড়ে উঠেছে গোপীচন্দ্রের গানে। নাথ সাহিত্যের একটি ধারা গোরক্ষ বিজয় - মীনচেতন ও অপর ধারাটি মানিকচন্দ্র - ময়নামতী - গোপীচন্দ্রের গান, এই শেষোক্ত ধারাটি অবলম্বন করে কোচবিহার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে এই গানের প্রাবল্য দীর্ঘদিন থেকেই অনুভূত হয়েছে। গোপীচন্দ্রের কাহিনী অত্যন্ত মানবিকগুণে সমৃদ্ধ। এই কাহিনী জনমানসে স্থায়ী আসন লাভ করার পেছনে রয়েছে নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের লোকপ্রিয় স্মৃতি।

শ্রদ্ধেয় ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য্য তাঁর 'গোপীচন্দ্রের গান' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, "গোপীচন্দ্রের গান এপিক ধর্মী রচনা — ইহার বিস্তার, ভাবগভীরতা এবং সমুচ্চ আদর্শ ইহাকে মহাকাব্যের গুণে মণ্ডিত করিয়াছে। যদি মৌখিক মহাকাব্য (Oral epic) বলিয়া কিছু থাকে তবে গোপীচন্দ্রের গান তাহাই"। গোপীচন্দ্রের গানের কাহিনীটি শুরু হয়েছে এভাবে ঃ "মানিক চন্দ্র রাজা ছিল ধর্মী বড় রাজা।/ ময়নাক বিভা করিল তার নওবুড়ি ভার্যা।/ ময়নাক বিভা করি রাজার না পুরিল মনের আশ।/ তারপর দেবপুরের পাঁচ কন্যা বিভা করি পুরি গেল মনের আবিলাস।" (গোপীচন্দ্রের গান - ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, পৃ - ১, ক.বি. ১৯৬০) 'গোপীচন্দ্র - ময়নামতীর' গানগুলি গল্পরস ও সাংসারিক অনুভূতির প্রকাশে আজও এতদঞ্চলের বৃহত্তম লোকজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ব্রতের গান ঃ কোচবিহারে লোকাচার ভিত্তিক ব্রত অনুষ্ঠানেও কথার পাশাপাশি গানেরও প্রচলন আছে। এ সকল গানে পারিবারিক কামনা বাসনার পাশাপাশি লৌকিক দেবদেবীর মহিমা যেমন প্রচার করা হয় তেমনি কৃচ্ছ্র সাধনের মাধ্যমে জীবনকে বিকশিত করার কথাও বলা হয়। এক কথায় সার্বিক মঙ্গল কামনাই ব্রতের গানের মূল উদ্দেশ্য। কোচবিহারে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য গীতি নির্ভর ব্রতগুলি হল — সুবচনী ব্রত, কাতিপূজার ব্রত, কাত্যায়নী ব্রত প্রভৃতি। প্রত্যেকটি ব্রতের মধ্যেই গানের প্রচলন আছে। গান এই ব্রতগুলির প্রাণ।

আনুষ্ঠানিক লোকগীতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ষাইটল, বিষহরি ও কাতি পূজার গান।

গীদালী বা মূলানী তাঁর নিজস্ব সুরে এই গান গেয়ে চলেন। ষাইটল ব্রতের গান গাওয়া হয় বসে, অপরপক্ষে কাতি পূজা এবং বিষহরি গান গাওয়া হয় দাঁড়িয়ে। নৃত্য এ গানের প্রধান অনুসঙ্গ হওয়ায় ঢাকের বাজনার তালে তালেই এ গান গাওয়া হয় এবং সবক্ষেত্রেই গান ও নৃত্যের অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পায় গ্রামীণ অপটু দক্ষতা। ষাইটল, বিষহরি ও কাতি পূজার ক্ষেত্রেও গানের ধারা মৌখিক পরম্পরায় চলে, এর কোন লিখিত রূপ নেই। এতদঞ্চলে প্রচলিত এরূপ গানের নমুনা নিম্নরূপ —

কাতিপূজার গান —

'আনিল মারেয়া ষোলটিয়া কলার থাতি,
কাতি দেওয়ানে বইসে রে।
আনিল মারেয়া কুমারের ঘট
কাতি দেওয়ানে বইসে রে।"

(নীলেশ্বরী নমদাস, গ্রাম - নাটাবাড়ী)

ষাইটল ব্রতের গান —

"তোরে বরে মা পুত্র পাইলাম কোলে
তোক বানেয়া আনলাম মালাকারের ঘরে
পূজা খাবার বইসেক মা তুই আমার ঘরে।"
(খুকি নমদাস, গ্রাম - নাটাবাড়ী)

বিষহরি ব্রতের গান —

গ্রামবাসী "যায় যায় বেহুলা নায়ে ফেলায় পাও
আমার ঘাটে চাপা নৌকা সেন্দুর পৈরা যাও।"

বেহুলা "না পিন্দি না পিন্দি তোমার সেন্দুর
আমি কাচা চুলের আরি
সেন্দুর জলতে ভাসেয়া দেও পিন্দুক বিষহরি।"
(নেন্দা বর্মন, গ্রাম — মাঘপালা)

ষাইটল ও বিষহরি গান মূলত ষষ্ঠী ও মনসার প্রসঙ্গে হলেও এতে কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গ আসে। যাকে কোচবিহারে বলা হয় খোসাগান। এই খোসা গানই ষাইটল ও বিষহরি গানকে জমিয়ে তোলে।

চারযুগের গান ঃ জেলার হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত চার যুগের গান। চার যুগের গান নারীর সন্তান ধারণের সময় ভ্রূণ সৃষ্টি থেকে শুরু করে গর্ভপাত পর্যন্ত দশমাস দশদিন পূর্ণ হলে জঠর থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোচবিহারের হিন্দু ও মুসলিম সমাজে প্রচলিত গানটি গাওয়া হয় দোয়ারী ও মূলের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। যেমন —

দোয়ারী — "এক না মাসের বেলা জানি কি না জানি
দুইয়ো না মাসের বেলা কিসের কানাকানি
তিন না মাসের বেলা কিসে কিসে জোড়া
পাঁচ না মাসের বেলা কিবা পুষ্প ফোটে
ছয় না মাসের বেলা কি বা উল্টি বসে
সাত না মাসের বেলা কি বা খাইতে চায়
অষ্ট না মাসের বেলা পবন জিয়ায়
নয় না মাসের বেলা কিবা গুণ স্থিতি
দশ না মাসের বেলা কিসের মুরতি।"

প্রতি উত্তরে মূল বলেন —

"এক না মাসের বেলা জানি কি না জানি
দুইয়ো না মাসের বেলা কিসের কানাকানি।
তিন না মাসের বেলা রক্তে ছান্দে গোলা,
চার না মাসের বেলা হার মাংস জোড়া।
পাঁচ না মাসের বেলা পঞ্চ পুষ্প ফোটে,
ছয় না মাসের বেলা যুগ উল্টি বসে
সাত না মাসের বেলা সাধ খাইতে চায়
আট না মাসের বেলা মন পবন জিয়ায়

নয় না মাসের বেলা নবগুণ স্থিতি
দশ না মাসের বেলা জনমের মুরতি।"

(কথক ঃ গোপাল নমদাস ও জলেশ্বর নমদাস, চারালজানি, মাছুয়ার টারি, নাটাবাড়ী ২ নং অঞ্চল, তাং - ৭/১১/৯৯ইং)

জারিগান ঃ বর্তমান পূর্ববাংলার মত উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারে মুসলিম সমাজে সারিগানের চেয়ে জারিগানের প্রচলন বেশী। সারিগানের কোন ধর্মীয় উপলক্ষ্য না থাকলেও জারিগানের মূল উপলক্ষ্য মহরম। তাজিয়া নিয়ে মহরমের দিন মুসলিম যুবকগণ লাঠি খেলার মাধ্যমে উদ্দাম বাদ্যের সঙ্গে একধরনের জারিগান করেন। হলদিবাড়ী ব্লকের টাউন ক্লাবের মাঠে প্রতিবছর মহরমের দিন প্রায় ২৫ টি এরূপ লাঠি খেলার দল উদ্দাম নৃত্যের মাধ্যমে জারিগান করেন।

কোচবিহার জেলার গুদাম মহারাণীগঞ্জ অঞ্চলে আমরা এক ক্ষেত্র সমীক্ষায় একটি জারিগান সংগ্রহ করি। স্থানীয় লোকশিল্পী গাটু মিঞা এই জারিগানটি গেয়ে শোনান। গাটু মিঞার মতে এই গান চারযুগের (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) গান নামেও প্রচলিত। লাঠি খেলার অন্তে কুড়ি পঁচিশ (২০/২৫) জনের একটি দল প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এরূপ গান করেন। উর্দু আ - লে - বে - তে - ছে - এই বর্ণের অনুসরণে গানের প্রশ্ন হল —

"আ - লেপ হরফে আসমান পয়দা
বে - হরফে জমি
তে - হরফে হিন্দু পয়দা
ছে - হরফে আমিন পয়দা
আসমান না ছিল কোথায় ছিল তারা।"

অপর এক গানে উক্ত গাটু মিঞা বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন বারে ঋতুবতী নারীদের সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে গান করেন। যেমন —

"প্রথম নারী ঋতুবতী যে দিবসে হয়
রবিবারে প্রথম ঋতু যে নারী পাবে
নারী থাকতে স্বামী তার মারা যাবে।"

স্থানীয় মুসলিম সমাজের বিশ্বাস যদি কোন নারী রবিবারে প্রথম ঋতুবতী হয় তবে সে অল্প বয়সে বিধবা হবে।

সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমগণই মহরম পর্ব উপলক্ষ্যে জারিনাচের মাধ্যমে এই গান করেন। মহরম উপলক্ষ্যে পীরের দরগায় বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক জারিগানের নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান । এসবই হিন্দু সংস্কৃতির লোকাচারের দ্বারা প্রভাবিত বললে অত্যুক্তি হয় না। কারণ মুসলিম ধর্মীয় বিধানে নৃত্যগীতমূলক আনুষ্ঠানিক বিনোদনের কোন বিধান নেই। এরূপ জারিগানে সকল ক্ষেত্রে পুরুষগণই অংশ গ্রহণ করেন। দলের দোয়ারী প্রথম গান ধরলে বাকিরা পরে সুর ধরেন। জারিগানের প্রধান ব্যক্তিকে বাংলা দেশে হাদি, উস্তাদ, জোকালী বলা হলেও কোচবিহারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 'দোহার' নামে পরিচিত। পোশাকের কোন নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা নেই। তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিল্পীগণ দৈনন্দিন ব্যবহার্য পোশাক পরেই গান করেন। মহরমের চাঁদ দেখা রাত্রি থেকেই জারিগান ও নাচের অনুষ্ঠানের প্রচলন একমাত্র হলদিবাড়ী ব্লকেই বেশী দৃষ্ট হয়। এক্ষেত্রে গৃহস্থগণ তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

কোচবিহারের লোকসংঙ্গীত উদ্ভব লগ্ন থেকেই কৃষি নির্ভর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জরিয়ে আছে। সেই সুবাদে আজও সমসাময়িক হয়ে উঠেছে পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে বহমান রেখেই এই গান।

লোককথা ঃ বংশানুক্রমিক কিংবা মৌখিক পরম্পরায় প্রচলিত ও গদ্য ভাষায় বর্ণিত লোক-শ্রুতি মূলক গল্পকেই লোক কথা বলা যায়। এ ধরনের লোক কথা সাধারণত সহজ সরল ভাবে এগিয়ে যায়। লোককথায় সাধারণত Motive লক্ষ্য করা যায়। এই Motive এর উপর ভিত্তি করেই লোক কথার ক্ষুদ্র আয়তন ঐতিহ্যকে ধরে বেঁচে থাকে।

কোচবিহারে লোককথার অলৌকিক শক্তির প্রকাশ যেমন দেখা যায়, তেমনি লোক জীবন ও লোক সমাজ-ও প্রস্ফুটিত হয়। লোককথার বিষয়বস্তু সবসময় বা সকল ক্ষেত্রে মানুষই হবে এমন কোন কথা নেই। অনেক সময় দেব দেবী ও পশু পাখীও এই লোককথার বিষয়বস্তু থেকে বাদ যায় না, তবে কোচবিহারের লোককথার সিংহভাগ জুড়ে আছে লোক জীবনের লোকাচার ও লোক ধর্মনির্ভর ব্রত কথা গুলি। লোক সংস্কৃতিবিদ্ ডঃ ওয়াকিল আহমেদ এর মতে 'যে জাতি বিচিত্র বিষয়ক, বহু সংখ্যক লোক কথার জন্ম দেয়, সে জাতি সাংস্কৃতিক চেতনায় ও জীবন রসে সমৃদ্ধতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা।'

কোচবিহারের লোকসাহিত্য বা মৌখিক সাহিত্যকে যদি আমারা লোকমনের তথা লৌকিক সমাজ মনের বিশেষ অভিব্যক্তির প্রকাশ মনে করি তবে সেটি অবশ্যই লোক কথা। লৌকিক কাহিনীনির্ভর প্রচলিত লোককথাগুলি কোচবিহারের লোক সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। অঞ্চলভেদে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আর্থ সামাজিক পরিবেশে লোককথার পটভূমিকায় যাই থাকুক না কেন এর মূল সমস্যা কিন্তু সবগুলিরই মানবিক। কোচবিহারের লোককথা লোক ভাষা নির্ভর।

বুড়া-বুড়ি আর শিয়াল ঃ

একদিন দুই বুড়া বুড়ি শ্যাক আলু গাড়ে। ওদিয়া জঙ্গল থাকি শিয়ালের ঘর উলুক ভুলুক করিয়া দেখে আর মনে মনে ধেন্দেলায়, ক্যামোন করিয়া বুড়ার শ্যাক আলু খাওয়া যায়। এক দুই করিয়া শিয়ালের ঘর বুড়াবুড়ির বগল আসিয়া কয় 'হ্যাঁ বাহে! বুড়ার ব্যাটা! ওটে তোমরা কি করেন?' বুড়া বুড়ি কয় 'শ্যাক আলু গাড়ি'। শিয়ালের ঘর ফির কয় 'শ্যাক আলু গাড়েন' তা ক্যাঙ করিয়া গাড়েন' বুড়া কয় 'ক্যা শ্যাক আলু মাটির তলোত থুইয়া পোঁতে থুইলে না হইল'। শিয়ালের ঘর কয় তে হৈলে তো বুড়ার ব্যাটা শ্যাক আলু তোমার মোটা হইবে না'। বুড়া বুড়ি কয় - 'ক্যা'? শিয়ালের ঘর কয় শ্যাক আলু যদি উসিয়া গাড়েন তে হৈলে দেখিবেন শ্যাক আলু ক্যামুন মোটা সোটা হয়। বুড়া বুড়ি শিয়ালের কতাক সচায় ভাবিয়া সউগ শ্যাক আলু গুলান উষান করি গাড়ি থুইয়া গেইল। ইদিয়া দিন বীতি যায় রাতি হৈল্। বুড়া বুড়ি বাড়ি আসিয়া মনে মনে কয় তে হৈলে এইনান করি গাড়িলে ঝ্যাদি মোটা সোটা হয় তে ভালে তো। হামরা তো এদ্দিন জানি না, রাতি পোয়াইলে যায়া দেখিমু একবার।

ইদিয়া শিয়ালের ঘর সগায় আসিয়া শ্যাকআলু খুড়িয়া হাতাপাতি খায়া শ্যাক আলুর চোচা ক্যালেয়া মাটি দিয়া ঢাকি থুইয়া গেইচে।

বুড়া সকালে আসি দেখে শিয়ালের ঘর কুল্ল্যে খায়া গেইচে। খালি চোচা গুলায় সার। বুড়া কয় - "শিয়ালের ঘরোক এই বার মজা দেখাইম। বাড়ি ঘুড়ি আসিয়া বুড়িক কইল, মুই বিচিনাত শুতি রঙ তুই মোক ক্যাতা কাপড় দিয়া ঢাকি থুইয়া কান্দেক গালা ছাড়ি দিয়া। বুড়া উদি এখান ছন্ ছনা ধারুয়া বেকি সাথোত নিল।

বুড়ি আনানি বিনানি করি কান্দে। তাকে শুনিয়া শিয়ালের ঘর কয় - 'বুড়ি বুড়ি, তোমার কি হৈচে?' বুড়ি কয় 'মোর কপাল ভাঙিচে। বুড়াটা মরি গেইলেক মুই এলা কি করোং?' শিয়ালের ঘর কয় - 'না কান্দেন, আমরা ইয়ার হিত চিন্তা করিমু।' এক না একনা করি শিয়াল বুড়ির ঘর সোন্দায় আর বুড়ার চাইরো পাকে বৈসে। বুড়ি কান্দে আর কয় - 'একনা না সোন্দাইল রে বুড়া।' বুড়া কয় 'হু'। আর একনা শিয়াল সোন্দায় বুড়ি কয় - 'দুকুনা সোন্দাইল রে বুড়া।' বুড়া কয় 'হু'। এ্যাঙ করি কুল্ল্যায় শিয়াল ঝ্যালা ঘর সোন্দাইল শ্যালা বুড়ি কয় - 'কুল্ল্যায় সোন্দাইল রে বুড়া' বুড়া হু কয়া ক্যাতার তল থাকি বিড়িয়া বেকি হাতোত ধরি খাড়া হইল। ইদি বুড়ি দুয়োর ঝাপেয়া বায়রা দুয়োর চিপি ধরি আচে। বুড়া কারও ঠ্যাং কাটিলেক, কারও ন্যেটু কাটিলেক, কারও টিকা কাটিলেক। ব্যাড়া চাটি ভাঙিয়া শিয়ালের ঘর দিল দৌড়। দৌড়াইতে দৌড়াইতে খ্যাড় বাড়িত

বইসে খ্যাড়ের আগাল গুতা নাগে, কয় এটেও বুড়া অসিচে। আরও দৌড়ায় ধান কাটা নাড়া বাড়িত বৈসে। ওটেও কাটা নাড় গুতা নাগে। আরও দৌড়ায় এ্যাংকরি শ্যাষোত বুড়ার বাড়ির ময়াল ছাড়ি ভালে দূর যায়া তবে শেনে উকাশ ফ্যালায়।

(লোভে পাপ আর পাপে হৈল বিনাশ।)

(কথক - প্রমোদ চন্দ্র সরকার, চাড়াল জানি, নাটাবাড়ী। তারিখ - ১২/৪/২০০০ইং)

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার রাভা জনজাতি সমাজে প্রচলিত পৃথিবী সৃষ্টি বিষয়ে লোককথা ঃ

সৃষ্টির আদিতে সব ছিল জলময়। রাভাদের অনাদি দেবতা মামা বোল্যা অপার সেই জলরাশির মধ্যে 'লউ কমপায়' বা লাউয়ের টোকরার মধ্যে তার দুই জৈক বা স্ত্রী দুর্গা জুং ও গঙ্গা জুংয়ের সঙ্গে ছিলেন ভাসমান।

একদিন তার বড় ইচ্ছা হল পৃথিবী সৃষ্টি করতে। তাই তার বীজ কোথায় পাওয়া যায় তা খোঁজ করতে জলের জীব মাগুর মাতা (মাগুর মাছ), নারান মাতা (চেং মাছ) এবং হ্যালং মাতা (কাকড়া বা হ্যান) কে ডেকে বললেন - 'যাও তোমরা এক এক করে খুঁজে আন পৃথিবী সৃষ্টির বীজ। আমি সুন্দর 'হাসং' বা পৃথিবী সৃষ্টি করব।' তিনি জানতেন এই তিন জনই হল পৃথিবী সৃষ্টির বীজ খুঁজে আনার উপযুক্ত, কারণ এদের প্রাণ ভীষণ শক্ত।

তাঁর আদেশে প্রথমে গেল মাগুর মাতা। মামা বোল্যা লাউয়ের টোকরায় দিনের পর দিন ভেসে আছেন, দিন যায় মাস যায়, মাগুর মাতা আর ফেরে না। তিনি বিস্মিত হয়ে একদিন দেখলেন মৃত অবস্থায় জলের উপর ভেসে উঠল মাগুর মাতা। এর পর তিনি ভার দিলেন নারান মাতাকে - 'খুঁজে আন কোথায় রয়েছে পৃথিবী সৃষ্টির বীজ'। নরান মাতাও সেই অপার জলরাশির মধ্যে তলিয়ে গেল। দিন যায়, মাস যায়, সে ফেরে না। অধীর আগ্রহ নিয়ে দিন গোনেন তার ফিরে আসার, কিন্তু না, একদিন সেও মৃত অবস্থায় ভেসে উঠল জলের তলা থেকে। মামা বোল্যা এবার ডাকলেন হ্যালং মাতাকে অর্থাৎ কাঁকড়াকে। বললেন 'তুমিই আমার শেষ সহায়, যাও তো কোথায় আছে পৃথিবী সৃষ্টির বীজ খুঁজে নিয়ে এস।'

কাঁকড়া তাকে প্রণাম করে ডুব দিল জলের গভীরে। মামা বোল্যার আশা, নিশ্চয়ই হ্যান তাঁর আশা পূরণ করতে সমর্থ হবে। তিনি অধীর আগ্রহে লাউয়ের টোকরার মধ্যে ভাসছেন আর ভাবছেন হ্যান ফিরে এল বলে। কিন্তু তাঁর অপেক্ষা আর শেষ হয় না। তিনি গভীর ভাবে চিন্তিত হলেন। একদিন দেখলেন তাঁর কাঁকড়াও প্রায় মৃত অবস্থায় জলের উপর ভেসে উঠল। অবশেষে তিনি ধ্যানে বস্‌লেন এবং দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন কাঁকড়ার দুই দাঁড়ের মধ্যে রয়েছে পৃথিবী সৃষ্টির বীজ।

তিনি খুঁজে তা নিয়ে এলেন। দুই হাতে ছেনে ছেনে তা দিয়ে গোল করে হাসং বা পৃথিবী গড়ে দিলেন। এর পর তিনি তৌচাক, বাচাক, মারাপনর‍্যা গড়লেন অর্থাৎ পশু, পাখী, বৃক্ষ লতাদি গড়লেন।

মানুষ কেন চিরজীবী নয় ঃ মামা বোল্ল্যা অবশেষে গড়লেন মারাপ বা মানুষ তো গড়লেন তারপর ভাবলেন তাকে তিনি করে তুলবেন একেবারে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, করবেন তাকে অমর এবং সেই জন্যই খুঁজতে বের হলেন কোথায় পাওয়া যায় শৈর চৈল পাক অর্থাৎ লোহা দিয়ে তৈরী প্রাণ, তা আনতে এবং তাঁর নতুন গড়া প্রাণ হীন মানুষ গুলোকে পৃথিবীর উত্তর কোণে লুকিয়ে রাখলেন। যাবার পূর্বে স্ত্রী দুর্গাজুং এবং গঙ্গাজুংকে বার বার নিষেধ করে গেলেন দ্যাখো তোমরা পৃথিবীর তিন দিকে যাবে কিন্তু উত্তর দিকে কখনই যেয়ো না।

তিন দিন তিন রাত যায়, সাত দিন সাত রাত যায়, মাস যায় মামা বোল্যা ফেরেন না। ওদিকে দুর্গাজুং ও গঙ্গাজুং ঠিক করল ঠাকুর পৃথিবীর তিন দিকে যেতে বলল অথচ উত্তর দিকে যেতে নিষেধ করল কেন? খুব কৌতূহল হল - চল তো দেখি ওদিকে কী আছে? তারা ওদিকে যেতেই, অবাক বিস্ময়ে দেখল ওখানে রয়েছে মিন হিংসারাম মারাপ অর্থাৎ সুন্দর সব নরমূর্তি। যেন তারা হাসছে - একটু ছোঁয়া বা একটু জল ছিটোলেই প্রাণ পেয়ে কথা কয়ে উঠবে। কোথায় জল? তাকিয়েই দেখে কচুর পাতার ওপর জল, সেই জল নিয়ে তাদের গায়ে ছিটিয়ে দিতেই তারা প্রাণ পেয়ে শোরগোল করতে লাগল।

ওদিকে মামা বোল্যা 'শৈর চৈল্ পাক' বা লোহার প্রাণ নিয়ে ফিরে এসে দেখেন তাঁর গড়া মানুষরা প্রাণ পেয়ে গেছে। হায় অমর করার জন্য যে প্রাণ নিয়ে এলেন তা আর তাদের দেহে সঞ্চার করা হয়ে উঠলো না। 'মারাপ চৈল্ পাক, লংচাকনি চিকা'। কচুর পাতার ক্ষণস্থায়ী জলে মানুষের প্রাণ সঞ্চারিত হল বলেই মানুষ ক্ষণজীবী, এ হল রাভা লোক বিশ্বাস। আর হ্যান বা কাঁকড়া দাঁড়ায় করে যে মাটি এনেছিল তা দিয়ে পৃথিবী গড়া হয়েছিল বলেই পৃথিবীর নাম হা বা হাসং হল।

(সংগ্রহ - সুনীল পাল - লোকচর্যা, শারদ সঙ্কলন, ১৩৯২, পৃ - ২৩ - ২৪।)

ব্রত কথা ঃ

ষষ্ঠী ঃ ষষ্ঠী ব্রতের মূল অনুষ্ঠান হবার পর বাড়ীর প্রবীণা ব্যক্তি ব্রত কথা বলেন। এমনি একটি ব্রত কথা হল - এক গ্রামে এক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ দম্পতি ছিলেন। সচ্ছল ব্রাহ্মণ পরিবারে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত বাড়ীর সকল কাজ করত ঝিয়েরা। তাই তারা খুব ভোর বেলায় এসে কাজ শুরু করত। কাল ক্রমে ব্রাহ্মণ রাজা হয়ে যায়। কিন্তু তখনও তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। এক ঝিয়ের ছিল সাত ছেলে। পাড়া প্রতিবেশীরা একদিন ঝিকে বলেন — 'তোমার কি ব্যাপার? তুমি কেন আটকুড়ার বাড়ী ভোর বেলা যাও? তুমি কি জাননা ভোরবেলা আটকুড়ার মুখ দর্শন করলে পাপ হয়?' একথা শুনে ঝি মনে মনে ফন্দি আঁটে এখন থেকে সে রাজার বাড়ী দেরী করে যাবে, যাতে ভোরবেলা নিঃসন্তান রাজার মুখ দেখতে না হয়। ঝি যা ভাবল তাই করল। অর্থাৎ ভোরের বদলে দেরী করে রাজার বাড়ী যেতে শুরু করল। বিস্মিত রাজা একদিন ঝিকে বললেন 'কিগো তুমি এত দেরী করে আস কেন?' উত্তর দিতে ঝি লজ্জিত বোধ করলেও শেষ পর্যন্ত প্রকৃত কারণটি বলে ফেলল। ঝি রাজাকে বলল - আমাকে পাড়া প্রতিবেশী এবং পথচারী সবাই বলে - 'তুমি সাত পুত্রের জননী আর রাজা আটকুড়া।' ঝিয়ের মুখে একথা শোনা মাত্র রাজা মনের দুঃখে পুত্র সন্তানের বর লাভের আশায় বাড়ি ছেড়ে চললেন। রাস্তায় বহু লোকের সঙ্গে রাজার দেখা হল তারা রাজাকে জিজ্ঞেস করেন - 'কি রাজা মশাই কোথায় চললেন?' রাজা উত্তর দেন - পুত্র সন্তানের বর লাভ করতে।

এমনি করে চলার পথে সাত জন পথচারী সাতস্থানে তাদের সাত রকম সমস্যার কথা রাজাকে বলেন এবং সমাধানের উপায় জেনে আসতে অনুরোধ করেন। যেমন প্রথম ব্যক্তি রাজাকে বলেন - রাজা তার সমস্যার কথা জানতে চাইলে পথিক জানালেন যে — 'তার কলাগাছে কলা ধরে পেকে যাচ্ছে কিন্তু কোন পাখী বসে না এবং খায় না। রাজা মশাই যেন এর কারণটা জেনে আসেন।' দ্বিতীয় ব্যক্তি তার সমস্যার কথা বললেন - 'আমার গরু বাচ্চা দিল কিন্তু গরু ও বাচ্চা হাম্বা হাম্বা করে না কেন?' তৃতীয় ব্যক্তি জানালেন - 'রাজা মশাই আমার নতুন ঘর তৈরীর পর কেন সব সময় মচ্ মচ্ করে? চতুর্থ পথিকের সমস্যা হল 'তার পুকুরের জল কাকে বকেও খায় না এবং মানুষও ছোঁয় না।' পঞ্চম পথিকের সমস্যা হল 'তার মাথায় শোলার বোঝা কিন্তু বোঝা কেন নামানো যায় না?' ষষ্ঠ পথিকের সমস্যা 'তার পাছায় পিড়ি আটকে আছে কিন্তু পিড়ি কেন খোলে না?' সপ্তম পথিকের সমস্যা 'তার মুখে চুন লেগে আছে কিন্তু চুন খসে পড়ে না কেন ?' এই সাতজন পথিক নিজের নিজের সমস্যার কথা জানান এবং সমাধানের উপায় জেনে আসতে বলেন।

পথের এই সাত পথিকের সাতরকম জিজ্ঞাসা ও নিজের পুত্র সন্তানের বর কামনার জন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রাজা একদিন মা ষষ্ঠীর বাড়ীতে হাজির হন। ষষ্ঠী দেবী তখন নদীতে স্নানে গেছেন। তিনি ফিরে এসে বাড়ীতে অপেক্ষমাণ রাজাকে দেখেই বিরক্তি বোধ করেন এবং দুর্মুসা বলে গালাগাল দেন। মা ষষ্ঠী বলেন - ' তোমরা ষষ্ঠী পূজার দিন ছেলে মেয়েদের দূর দূর কর কেন ? ষষ্ঠী পূজার দিন তোমরা ছেলে মেয়েদের আদর করনা এবং পূজার পর তাদের প্রসাদও দাও না। এ জন্যই তোমাদের এত সমস্যা। তোমার সন্তান হতে পারে তবে একটি শর্তে, পূজার পর ছেলে মেয়েদের প্রসাদ দিতে হবে, তাদের আদর করতে হবে।' মা ষষ্ঠী আরও বলেন কলা গাছে কলা হলে তোমরা কলা বিক্রি করে দাও, নিজেরা খাও কিন্তু পাড়া প্রতিবেশী বা ছোট ছেলে মেয়েদের দাও না। ছেলে মেয়েদের দিয়েও মাঝে মাঝে বাল্য সেবা করতে হবে। তোমাদের গাইয়ে বাচ্চা দিলে প্রথমেই দুধ বিক্রি কর বা খাও, কিন্তু তা না করে প্রথমে ব্রাহ্মণ সেবা দিতে হবে। তারপর নিজেদের খেতে হবে। তোমরা পুকুরে জল ভর্তি থাকা সত্ত্বেও মানুষকে নামতে দাও না বা স্নান করতে দাও না। সবাইকে পুকুরের জল ব্যবহার করতে দিতে হবে। ঘর দিয়ে পূজা না করে, বাচ্চাদের প্রসাদ না দিয়ে গৃহ প্রবেশ করলে ঘর মচ মচ করবে। কাজেই গৃহ

প্রবেশের পূর্বেই নারায়ণ পূজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবে।' মা ষষ্ঠী শেষে বললেন - 'কলার মাইচ পাতায় জল, দুধ ও আমফল নিয়ে তোমরা বউকে খাওয়াও।'

রাজা বাড়ী গিয়ে তাই করলেন এবং যথারীতি রাণী সন্তান সম্ভবা হলেন। রাণী গর্ভবতী থাকাকালীন রাজা ভাবলেন যে রাজসভা থেকে রাণীর অবস্থান অনেক দূরে, তাই তাঁকে সব সময় চিন্তায় থাকতে হবে। রাজা বুদ্ধি করে রাজ সভায় একটি ঘন্টা বেঁধে দিলেন এবং ঘন্টার সঙ্গে একটি দড়ি বেঁধে সেটি রাণীর ঘর পর্যন্ত জুড়ে দিলেন। ঝিদের বলে দিলেন রাণীর হঠাৎ কোন প্রয়োজন পড়লে সেই দড়ি ধরে টানলেই তিনি চলে আসবেন। রাজা সব সময় উৎকর্ণ থাকেন কখন ঘন্টা বাজবে। বাড়ীর ঝিয়েরা স্বাভাবিক ঔৎসুক্য বশত একদিন ঘন্টার দড়ি ধরে টান দেয়। রাজা ঘন্টার শব্দ শোনামাত্র ছুটে আসেন এবং রাণীকে জিজ্ঞেস করেন 'কি দরকার ? ঘন্টা বাজালে কেন ?, রাণী তখন বললেন - 'আমি তো ঘন্টা বাজাইনি।' রাজা তখন ক্ষুব্ধ হয়ে রাজ সভায় ফিরে যান। এদিকে রাণীর যে দিন প্রকৃতই প্রসব যন্ত্রণা শুরু হল সে দিন ঝিয়েরা ঘন্টা বাজানো সত্ত্বেও রাজা আসেননি। ঝিয়েরা নিজেরা তৎপর হয়ে রাণীমার শুশ্রূষা করার পর রাণীমা একটি কুমড়ো প্রসব করেন। এ অবস্থায় তারা কি করবে বুঝতে না পেরে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে কুমড়োটিকে ফেলে দেয়। তৎক্ষণাৎ কুমড়োটি ফেটে তার ভেতর থেকে সাত ছেলে ও এক মেয়ে বেরিয়ে আসে। মা ষষ্ঠী রাজাকে এক চড় মারেন। অনেক কাকুতি মিনতির পর মা ষষ্ঠী সাত ঝিকে একটি করে ছেলে দিয়ে দেন আর মেয়েটিকে আর একজনকে দিয়ে দেন। কালক্রমে ছেলেরা বড় হয়ে ওঠে, তাদের বিয়ে হয় এবং তারা সংসারী হয়। একদিন রাজা ও রাণী উভয়েই দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। মা ষষ্ঠীর একদিন ইচ্ছে হল বুড়ী সেজে কিছু তুলো এনে সাত ছেলের সাত বউকে বাছতে দেন, তারা বেছেও দিল কিন্তু সাত বউয়ের ছেলেরা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ঢলে পড়ল। সাত বউ দৌড়ে গিয়ে মা ষষ্ঠীর কাছে নালিশ করেন। মা ষষ্ঠী বলেন - 'পূজার দিন অবহেলা করলে এমনই হয়, পূজার জল নিয়ে ছেলেদের মুখে ছিটিয়ে দাও। তারা বেঁচে উঠবে।'

অনেকদিন পর মা ষষ্ঠীর ইচ্ছে হল যে ওরা কেমন আছে দেখে আসবেন। রাণী চলে যাবার পূর্বে তাঁর হাতের বালা ডালিম গাছে এবং করঞ্চা গাছে রেখে দেন। বড় ছেলের বউ ডালিম গাছে হাত দেওয়া মাত্র ছেলেরা আবার ঢলে পড়ে। তার পর মা ষষ্ঠীর কৃপায় পুনরায় বেঁচে ওঠে। একদিন সাত ছেলে ও তাদের বউদের মা - বাবার কথা খুব মনে হতে থাকে।তারা নদীর ঘাটে নৌকা থামিয়ে যাত্রীদের বলেন 'তোমরা আমাদের বাবা মাকে দেখেছ ?, সবাই জানিনা বলে এড়িয়ে যান। কিন্তু শেষের নৌকায় সওদাগর বেশে রাজা রাণী তাদের সামনে এসে দেখা দেন। রাজা রাণী তাদের বলেন তোমরা ষষ্ঠী পূজা দিয়ে সন্তানদের ষাঠ দিও। কিন্তু কখনই ভাগনার ছেলেকে না দিয়ে শুধু মাত্র নিজের ছেলেকে দিও না।' এমনি করে মা ষষ্ঠীর কৃপায় রাজা রাণী ও তাদের পুত্র, পুত্রবধূদের মিলন ঘটে এবং তারা সুখের জীবন যাপন করতে থাকেন।

(কথক - পারুলবালা ধর, স্বামী - ক্ষেত্র মোহন ধর , মেখলিগঞ্জ, তাং - ৫/৭/২০০১ইং)

নাটাই চন্ডীব্রত কথা ঃ ষষ্ঠী ব্রতের মত নাটাই চন্ডী ব্রতের পূজার শেষেও ব্রত কথা বলেন কোন প্রবীণা। নাটাই চন্ডীব্রত কথার প্রচলিত কাহিনীটি এরূপ - এক গ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী তাদের দুটি মেয়েকে সঙ্গে বাস করতেন। তাদের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। মেয়ে দুটি প্রতিদিন ভিক্ষা করতেন এবং ভিক্ষার দ্বারাই সংসার চালাতেন। তারা একদিন ভিক্ষা করতে গিয়ে দেখেন এক বাড়ীতে নাটাই চন্ডী দেবীর পূজা হচ্ছে। দুই বোন পূজা দেখেন আর ভাবেন 'একদিন যখন সুদিন আসবে তখন আমরাও বাড়ীতে নাটাই চন্ডী পূজা করব।' স্বপ্নে দেবীর নির্দেশে ব্রাহ্মণী নাটাই চন্ডীর পূজা করেন। পরদিন ঘুম থেকে উঠে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দেখেন তাদের বাড়ী রাজপ্রাসাদে পরিণত হয়েছে আর তারা নিজেরা রাজা - রাণী হয়েছেন। বাড়ী ঝি - চাকরে ভর্তি, গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ। এ সবই নাটাই চন্ডী দেবীর কৃপায় হয়েছে। তাই ব্রাহ্মণ পরিবার নিয়মিত নাটাই চন্ডী দেবীর পূজা করেন।

একদিন ভিন্ রাজ্যের এক রাজা শিকারে এসে রাত্রি হয়ে যাওয়ায় ঐ বাড়ীতে থাকেন। তারা রাত্রে রাজাকে অমৃত রান্না করে খাওয়ান। রাজা খুশি হয়ে বড় বোনকে বিয়ে করেন এবং ছোট বোনকে নিয়ে গিয়ে অন্য দেশের রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেন। এদিকে বড় বোনের এক ছেলে ও এক মেয়ে হয়। ঘটনা চক্রে তাদের পরিবারে নাটাই চন্ডী দেবীর পূজা বন্ধ হয়ে

গেলে সংসারে অশান্তি শুরু হয়। অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে কায়ক্লেশে তাদের দিন চলতে থাকে। একদিন বড় বোন ভাবলেন যে ছোট বোনের বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসবেন। এই উদ্দেশ্যে এক দিন ছেলে ও মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ছোট বোনের বিশাল বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হন। ছেলে মেয়েদের হাতে তার নিজের নামাঙ্কিত একটি আংটি দিয়ে তাদের বাড়ীর ভিতরে পাঠিয়ে দেন এবং তিনি বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন। ছেলে মেয়েরা আংটি নিয়ে গিয়ে ছোট বোনকে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের চিনতে পারেন এবং তাদের মাকেও (বড় বোন) বাড়ীর ভিতরে নিয়ে আসতে বলেন। অতপর বড় বোন ছেলে মেয়ে নিয়ে বোনের বাড়ীতে কিছুদিন বেশ ভালভাবেই কাটান। দিদির দুর্দশার কথা শুনে ছোট বোন একদিন তার দিদিকে বলেন যে, নাটাই চন্ডী দেবীর অবহেলা করার জন্যই তাদের এই দুরবস্থা। তিনি তার দিদিকে পুনরায় নাটাই চন্ডী দেবীর পূজার পরামর্শ দেন। ছোট বোনের কথায় বড় বোন বাড়ী ফিরে এসে পুনরায় নাটাই চন্ডী দেবীর পূজা করেন এবং হৃত গৌরব ফিরে পান। অতঃপর মা নাটাই চন্ডীর কৃপায় স্বামী ও পুত্র কন্যা সহ নিজ রাজ্যে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে থাকেন। এই ব্রতের শেষে ব্রতীগণ বলেন - 'লুনা আলুনা আলোতে নিয়ে অন্ধকারে খাবে। নুন পড়লে ভাল।'

(কথক - প্রণতি দত্ত, স্বামী - সুধীর দত্ত, গ্রাম - ধলপল, তুফানগঞ্জ, তাং - ৮/৩/২০০১ ইং)

নিরা-কলি ব্রত কথা ঃ এক ব্রাহ্মণ তার একমাত্র কন্যাকে রেখে মারা যান। কিছুদিন পর ব্রাহ্মণীও স্বামীর মৃত্যু শোকে মারা যান। অসহায় ব্রাহ্মণ কন্যার একমাত্র অবলম্বন তার অশীতিপর বৃদ্ধা ঠাকুরমা। ঠাকুরমার কাছেই সে মানুষ হতে থাকে। তাদের আহারের সংস্থান হয় ভিক্ষার মাধ্যমে। ব্রাহ্মণ কন্যা সারা দিন ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করেন। এই ভাবে ভিক্ষা করতে করতে একদিন এক বাড়ীতে গিয়ে দেখে সেখানে পূজা হচ্ছে। উৎসুক হয়ে সে কী ঠাকুরের পূজা হচ্ছে তা জানতে চায় এবং এই পূজা করলে কি লাভ হবে তাও জানতে চায়। এই পূজার কারণ শুনে দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা দেবীকে প্রণাম করে এবং স্বামী পুত্র কন্যা সহ সুখী সংসার জীবন কামনা করে। ঘটনা চক্রে সে ঐদিন অনেক বেশী ভিক্ষা পায়। নাতনী ও ঠাকুমার খাওয়ার পরও সেদিন অনেক কিছু উদ্বৃত্ত থেকে যায়। ব্রাহ্মণ কন্যা তাই নিরাকলি দেবীর পূজা করার জন্য ঠাকুমার কাছে আব্দার করে এবং ঐ উদ্বৃত্ত জিনিস দিয়ে নিরাকলি দেবীর পূজা করেন। দৈবানুগ্রহে ঐ পূজার দিন দূর গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবার তাদের পুত্রের বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে আসেন। অনেক মেয়ে দেখেও তাদের পছন্দ হয় না কিন্তু ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেখা মাত্র তাদের পছন্দ হয় এবং তারা ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে তাদের পুত্রের বিয়ে দেন। এই বিয়েতে ব্রাহ্মণ কন্যার শর্ত ছিল যে শ্বশুর বাড়ীতে ঘরে ওঠার পূর্বে সে নিরাকলি দেবীর পূজা করে ঘরে উঠবে। শ্বশুর মশাই তাতে রাজী হয়ে যান। এর পর পূজা করে শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার পর থেকেই তাদের ধন সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সবই নিরাকলি দেবীর আশীর্বাদ। কালক্রমে তারা রাজ রাণীতে পরিণত হন।

রাণী হওয়ার পর ব্রাহ্মণ কন্যার একটি পুত্র সন্তান হয়। ভোগ লালসায় ব্যস্ত হয়ে সে নিরাকলি দেবীর আরাধনা ভুলে যায়। ধীরে ধীরে বাড়ীতে গবাদি পশু, ক্ষেতের ফসল সবই নষ্ট হতে থাকে। এদিকে রাণী ব্রাহ্মণ কন্যা পুনরায় সন্তান সম্ভবা হয়। ব্রাহ্মণ রাজা বলেন - 'এই দুরবস্থায় আর এখানে থাকব না।' তাই সে রাজ্যপাট ফেলে সুখের সন্ধানে সন্তান সম্ভবা স্ত্রী ও এক ছেলেকে নিয়ে গ্রামান্তরে যাত্রা করেন। যাত্রা পথে জঙ্গলেই ব্রাহ্মণীর এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ঐ মূহূর্তে জলের ভীষণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ রাজা শিশু পুত্রদ্বয় সহ রাণীকে ঐ জঙ্গলে রেখে জল ও আগুনের সন্ধানে বের হন।

সেই সময় পার্শ্ববর্তী দেশের রাজা তার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় রাজচক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত লোকের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যার কপালে রাজটীকা দেখবেন তাকেই রাজ মুকুট পরিয়ে তার দেশের রাজা করবেন। দৈবক্রমে এ সময় জল নিয়ে ফেরার পথে নিঃসন্তান রাজা তাঁর সামনে পড়ে যায়। তার কপালে রাজটীকা দেখে তাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রাজ মুকুট পরিয়ে দিয়ে পাশের দেশের রাজা তাকে নিয়ে চলে যান। এদিকে ব্রাহ্মণ রাজার জল নিয়ে ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে ব্রাহ্মণী বড়ছেলের কাছে ছোট ছেলেকে রেখে নিজেই জলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এই সময় তার নিরাকলি দেবীর কথা স্মরণ হয় এবং সে একমনে নিরাকলি দেবীকে ডাকতে থাকে। কোথাও জল খুঁজে না পেয়ে ব্রাহ্মণী রাণী এক নদীর ঘাটে গিয়ে হাজির হয়। ঘাটে গিয়ে সে দেখে সওদাগরগণ বড় বড় নৌকাদিয়ে ঘাট আগলে বসে আছে। জল নেবার জন্য সে সওদাগরদের নৌকা একটু সরাতে বলে। মাঝি - মাল্লা ও সওদাগরগণ রাণীর কথায় কর্ণপাত করেনা। রাণী

তখন আবার বলে 'আমি নিজের হাতে নৌকা সরিয়ে জল নেব।' রাণীর কথা শুনে এবার সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। কিন্তু নিরাকলি দেবীর ক্ষমতা সম্বন্ধে তারা ছিল অজ্ঞাত। রাণী নিরাকলি দেবীর নাম স্মরণ করে নৌকায় ধাক্কা দেওয়া মাত্র নৌকা সরে যায়। রাণীর এই ক্ষমতা দেখে সবাই অবাক হয়ে যায় এবং ভাবে এই কাজ তো কোন সাধারণ নারীর পক্ষে সম্ভব নয়, এ নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্না নারী। সওদাগররা তখন রাণীকে জোর করে নৌকায় তুলে নিয়ে যায়।

এদিকে বনের মধ্যে রাণীর ছেলেরা কান্না কাটি করছে। সওদাগররা রাণীকে নৌকায় চাপানোর পর নিরাকলি দেবীর কাছে রাণী কায়মন বাক্যে প্রার্থনা করতে থাকে - দেবী আমাকে 'কুৎসিত কর, কুষ্ঠ রোগ দাও,রূপ যৌবন নষ্ট করে দাও, আমার ছেলেদের রক্ষা কর। নিরাকলি দেবী সদয় হয়ে তার দুই পুত্রের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি নবজাতক শিশুদুটিকে বাঁচানোর জন্য এক নতুন ফন্দি আঁটেন। তিনি কমল ঘোষ নামক এক নিঃসন্তান গোয়ালাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য মনস্থির করেন। কমল ঘোষের অনেকগুলি গরুর মধ্যে একটি ছিল কামধেনু । তার গরুগুলির তত্ত্বধান করে একজন রাখাল। রাখাল যখন গরু চড়াতে জঙ্গলে যায় তখন ঐ কামধেনু গোপনে গিয়ে নবজাতক শিশুদুটিকে দুধ খাইয়ে আসে। এদিকে গোয়ালার বাড়ীতে দুধের পরিমাণ কমে যায়। এভাবে কিছুদিন চলার পর কমল ঘোষ একদিন গরুর দুধের পরিমাণ হঠাৎ করে কমে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রাখাল তখন কামধেনুর শিশুদুটিকে দুধ খাওয়ানোর কাহিনী খুলে বলে। নিঃসন্তান কমল ঘোষ তখন রাখালকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে শিশুদুটির কাছে ছুটে যায় এবং ঐ দৃশ্য দেখে শিশু দুটিকে নিয়ে এসে তার স্ত্রীকে লালন পালন করার দায়িত্ব দেন। গোয়ালিনী শিশুদুটি পেয়ে আত্মহারা। তিনি ভাবলেন দেবী এত দিনে তার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। কমল ঘোষ তার স্ত্রীকে দশ মাস দশদিন গর্ভবতী সেজে থাকার পরামর্শ দেন। দশ মাস দশদিন গর্ভবতী সেজে থেকে গোয়ালিনী প্রচার করেন যে তার যমজ সন্তান হয়েছে। দিন যায় ছেলেরা বড় হয়, লেখাপড়া শেখে। কমল ঘোষ ছেলেদের দুধের ব্যবসা করতে বলেন কিন্তু ছেলেরা রাজী হয় না। তাদের মনে সন্দেহ যে তারা গোয়ালার ছেলে নয়। কারণ বড় ছেলেটির আগের কথা কিছু কিছু মনে ছিল। কমল ঘোষ ছেলেদের খেয়া পারাপারের চাকরী জোগার করে দেন। নৌকা পারাপার করার জন্য ছেলেরা নদীর পাড়ের চালা ঘরেই থাকত। বড় ভাই ছোট ভাইকে তার মা বাবার কথা কিছু কিছু বলত। এ দিকে অনেক ঘাটে ঘুরতে ঘুরতে সওদাগরের নৌকা একদিন রাণীকে নিয়ে গোয়ালার ঘাটে পৌঁছয়। বড় ভাই তখন ছোট ভাইয়ের কাছে গল্প বলছিল। এই গল্প রাণীও শুনে ফেলেন। গল্প শুনতে শুনতে রাণী বুঝতে পারেন যে এরা তারই হারানো পুত্র। তখন রাণী ছেলেদের কাছে তার পরিচয় দিয়ে বলেন যে 'আমিই তোদের মা'।

কমল ঘোষের স্ত্রী গোয়ালিনী একথা শুনতে পেয়ে তার মাতৃত্বের দাবী জানায় । এভাবে দুই ছেলের মাতৃত্বের দাবী নিয়ে রাণী ও গোয়ালিনীর মধ্যে বিতর্ক শুরু হলে প্রকৃত মা কে তা নির্ণয় করার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশের রাজার কাছে বিচার চান। এই রাজা সেই ব্রাহ্মণ রাজা অর্থাৎ ছেলেদুটির পিতা যিনি জল আনতে গিয়ে হারিয়ে গেছেন। রাজা বিধান দেন কে সত্যিকারের মা তার প্রমাণ দিতে হবে। রাজা তাই নদীর এক পাড়ে ছেলেদের দাঁড় করান। অপর পাড়ে দুই মাকে দাঁড় করান। তিনি বলেন যার স্তন থেকে দুধ 'ছেলেদের' মুখে যাবে সেই হল ছেলেদের প্রকৃত মা। পরীক্ষায় দেখা গেল রাণীর স্তন থেকে দুধ গিয়ে ছেলেদের মুখে পড়ল অপর দিকে গোয়ালিনীর স্তন থেকে এক ফোঁটা দুধও বের হল না। অতঃপর মা ও ছেলের মিলন দেখে রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন 'আমারও দুই ছেলে এবং স্ত্রী জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে। রাজার কথা শুনে রাণী তখন তার সব কাহিনী খুলে বলল। রাজা - রাণী ও তাদের ছেলেদের মিলন ঘটল। তারা গোয়ালা কমল ঘোষ ও তার স্ত্রীকে প্রচুর ধনসম্পদ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা ও রাণী তাদের সন্তানদের নিয়ে সাড়ম্বরে নিরাকলি দেবীর পূজা করে পুনরায় সুখে সংসার করতে লাগলেন।

(কথক ঃ মায়ারাণী বসাক, স্বামী - কুটিশ্বর বসাক, তুফানগঞ্জ শহর (পূর্বতন ময়মন সিংহ, গ্রাম - ভালকুইট্যা গোবিন্দাসী, তাং - ১৬/৪/২০০০ ইং।)

কাত্যায়নী ব্রতকথা ঃ কাত্যায়নী ব্রতকথার মূল বিষয় বস্তু হল হর - গৌরীর বিবাহ সম্পর্কিত কাহিনী। বিভিন্ন সুরে গানের ভিতর দিয়ে এই ব্রতকথা শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ব্রতীগণ গানের মাধ্যমেই ব্রতকথা প্রকাশ করেন। এর মধ্য দিয়ে যুবতী মেয়েদের আশা- আকাঙ্ক্ষা, রঙ্গরস, কারুণ্য ও বাৎসল্য প্রকাশ পায়।

প্রাচীন বিবাহ প্রথায় দেখা যায় কন্যার বয়স নয় বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তার বিয়ে দেওয়া হত। সে নিয়মে সাত বছর পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুপাত্রের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই ব্রতকথার একটি গানে শোনা যায় —

"গৌরীর বিয়াও দিমু পুব দেশে
পূব দেশে আছে নেংটিয়া শিব তাক দিমু গৌরীকে
না দিম নাদিম নেংটিয়া শিবের ঘরে।"

এদিকে শিবেরও বয়স হয়ে যাচ্ছে। আত্মীয় - স্বজনহীন অনাত্মীয় শিব কতদিন আর বিয়ে না করে থাকবেন। ভূত - প্রেত, নন্দী - ভৃঙ্গী ইত্যাদি চ্যালা চামুন্ডারাই শিবের একমাত্র ভরসা। বিয়ের চিন্তায় শিব নিজেই চিন্তিত। চ্যালা চামুন্ডাদের চিন্তা তাঁর থেকেও বেশী। তাদের চিন্তা শিবের যদি বিয়ে না হয় তাহলে জগতে সুখ শান্তিও আসবে না। তাই নারদকে এই বিয়ের ঘটক নিযুক্ত করা হয়। নারদের মাধ্যমে উভয় পক্ষই জানতে পারে তাদের বিয়ে হবে অর্থাৎ গিরিরাজ কন্যা উমার সঙ্গে কৈলাশপর্বতের দেবাদিদেব মহাদেবের বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। দুজনের বাড়ীতেই বিয়ের আয়োজন চলতে থাকে। এদিকে নারদ বিয়ের আগেই শ্মশানচারী আত্মভোলা শিবের দুরবস্থা সম্পর্কে মেনকাকে আগাম জানিয়ে তার মনকে দুর্বল করে দেয়। বিয়ের আসরে ভূত, প্রেত, নন্দী - ভৃঙ্গী ইত্যাদি বরযাত্রী সহ শিবকে আসতে দেখে মেনকার মন আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বাস্তব অবস্থা দেখে মেনকা চোখের জলে ভাসতে থাকেন আর তাঁর মনে হয় এর চেয়ে আদরের মেয়েকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া ভালো ছিল। এয়োতি বা বৈরাতিগণ যখন শিবকে বরণ করতে আসেন তখন তারা অবাক হয়ে দেখেন পাত্র শিব বাঘছাল পরিহিত এবং তার কণ্ঠে সাপ। বরকে চন্দনের ফোঁটা দিতে গেলেই কণ্ঠলগ্ন সর্পদ্বয় এয়োতিদের ছোবল মারে এবং তারা অজ্ঞান হয়ে যায়। তাই ব্রতকথার একটি গানে মেনকার খেদোক্তি শোনা যায় —

"মেনকা কাঁদিয়া কয় শুন প্রভু মহাশয়
এহেন বরে না দিমু গৌরীর বিয়াও রে।"

একথা শুনে শিব প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হন। তাঁর ক্রুদ্ধ শ্যেন দৃষ্টিতে বিয়ের আসর লন্ডভন্ড হয়ে যায়। মেনকা অঝোরে কাঁদতে থাকেন। এরূপ দুঃসহ অবস্থা দেখে উমা শিবকে তার রূপ পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করেন। উমার অনুরোধে শিব রূপ পরিবর্তন করেন। অবশেষে বিয়ের কাজ শুরু হয়। চন্দ্র, সূর্য সাক্ষী রেখে ব্রহ্মার সাহায্যে পিতৃ - মাতৃহীন শিবকে কন্যা সম্প্রদান করেন গিরিরাজ। সম্প্রদানের পর হর গৌরীর মিলন ঘটল। স্বর্গ - মর্ত্য - পাতাল ভরে উঠল আনন্দের বাতাবরণে। হিন্দু - বাঙালী লোকাচার অনুযায়ী বিয়ের পর শিব ও উমা পাশা খেলতে বসলেন। যথারীতি উমাকে হারিয়ে শিব তাঁকে জয় করলেন। এমনি করে বিয়ের রাত্রি পার হবার পর ভোরের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গৌরী যাত্রা করে শ্বশুর বাড়ির দিকে। মা মেনকা গৌরীর কথা মনে করে স্মৃতি চারণা করে কাঁদতে থাকেন। একদিকে বাৎসল্য রস আর একদিকে কন্যার বিরহ ব্যাথা। ঘুম কাতুরে সাত বছরের ছোট মেয়ে কি করে শ্বশুর বাড়ি আগলাবেন এই চিন্তায় মা মেনকার মন অস্থির। তাই তিনি বলেন - 'সাত বছরের গৌরী মোর কেমনে করিবে পরার ঘর।' এই ভাবে কাত্যায়নী ব্রত কথা শেষ হয় এবং ব্রতীগণ পূজার যাবতীয় বস্তু জলে ভাসিয়ে দিয়ে প্রার্থনা করেন, মা দুর্গা যেন তাদের ধনধান্যে ভরিয়ে তুলে স্বামী পুত্রের ছোট সংসারকে সুখী ও সমৃদ্ধ করেন।

(কথক - আশুনেশ্বরী দাস (৮০), স্বামী মৃত মায়াচাঁন দাস, গ্রাম - নাটাবাড়ী, তুফানগঞ্জ, ৫/১১/৯৯ ইং)

লোক নাটক ঃ

লোক সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হল লোক নাটক। অনেকেই এই নাটকের সংজ্ঞা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করলেও লোক নাটকের সঠিক স্বরূপের অভিব্যক্তি ঘটেনি এই সব সংজ্ঞায়। এর উৎপত্তির ক্রমবিকাশ আলোচনায় আমরা দেখতে পাই, লোক নাটক প্রকৃত পক্ষে অবস্তু নির্ভর ভঙ্গীগত বাগাশ্রিত লোক সাহিত্যের একটি শাখা। যার বিষয়বস্তু মৌখিক ও শ্রুতি নির্ভর সংলাপধর্মী। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের লোকনাটকের মত কোচবিহারের লোকনাটকের মূলেও আছে বিভিন্ন ব্রত ও লৌকিক অনুষ্ঠান, সঙ নাচ ও লৌকিক নৃত্যানুষ্ঠান। একাধিক গ্রামে উপস্থিত থেকে আমরা প্রত্যক্ষ করি মূলানীর নেতৃত্বে সুবচনীর হাঁস চুরির অপরাধে বালককে শাস্তি প্রদান, পরে ভুল স্বীকার, পাড়া প্রতিবেশীদের সহানুভূতি লাভ সবই

মূল মন্ডপের চারদিকে ঘিরে অভিনয় প্রদর্শন করা হয়। যার মাধ্যমে পুরো একটি কাহিনী অভিনয়ের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। আবার ষাইটল পূজা ও কাতি পূজার আঙ্গিকে গিদালীর নেতৃত্বে দেবীর আবাহন, ঘট সিজ্জন প্রভৃতির যে গীত সহযোগে নৃত্যানুষ্ঠান হয় সেটি নাটকের আদিম রূপ। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় কোচবিহারে লোক নাটকের উদ্ভব হয়েছিল এ ধরনের ব্রত অনুষ্ঠান থেকেই। ডঃ দুলাল চৌধুরী লোকনাটকের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেন - "বাংলার আনুষ্ঠানিক ব্রতগুলি মূলত নাটকের প্রত্নরূপ" [১৪]

এতদঞ্চলে ক্ষেত্র সমীক্ষা, সাক্ষাৎকার ও তথ্যানুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন লোক নাটকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে লোকনাটকের যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা লক্ষ্য করেছি তা হল - এগুলির কোন স্রষ্টা থাকলেও তিনি উপলক্ষ মাত্র। তিনি লোক সমাজের একজন। আজও কোচবিহারে লোকনাটক মঞ্চস্থ হয় জেলার বিভিন্ন লোকউৎসব ও মেলার জনসমাগম পূর্ণ আসরে। সেখানে দর্শক শ্রোতার মধ্যে একটা সান্নিধ্য বর্তমান থাকে।

লোকনাটকের সংজ্ঞা নির্ধারণ সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যায় - "লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে বর্ণিত এবং অভিনীত নাটক। কোন পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিকতার ভিতর প্রবেশ করা সঙ্গত নয়। তার কাহিনীতে পূর্ববর্তী কোন ধারা কিংবা ঐতিহ্য থাকে না।" [১৫]

সাম্প্রতিক কালে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের উপর গবেষণা উদ্ভূত সংজ্ঞাটি হল - "তাৎক্ষণিক ভাবে লোকভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় মুখে মুখে রচিত অসাম্প্রদায়িক লোকাশ্রিত বা ধর্মীয় বা পৌরাণিক কাহিনী, আশ্রিত চরিত্র সমসাময়িক লোকায়ত সমাজের প্রেক্ষাপটে লোকায়ত সমাজ গ্রাহ্য তাৎক্ষণিক উক্তি প্রত্যুক্তি সহযোগে লোকগীতি - নৃত্য এবং লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের মাধ্যমে লৌকিক সাজে সজ্জিত হয়ে লোকাকীর্ণ উন্মুক্ত আসরে অভিনয়ের সাহায্যে যা প্রকাশ করা হয় তাকেই লোকনাটক বলা যায়।" [১৬]

বিশিষ্ট লোক সংস্কৃতিবিদ ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে Myth বা Ritual মিলিত হয়ে কোন সংহত লোকগোষ্ঠীর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তারই নাট্যরূপ লোকনাটক।

কোচবিহারের লোকনাটককে সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা — (ক) আনুষ্ঠানিক (খ) আখ্যানমূলক এবং (গ) বিবিধ বিষয়ক।

কিন্তু কাহিনীর বিচারে কোচবিহারের লোকনাটককে সঠিক বিভাজন করলে মূলত দুটি ভাগ করা যায় - (ক) দোতরা পালা ও (খ) কুষাণ পালা। এক সময় বিষহরি পালার কিছু স্বতন্ত্র নাট্যরূপ ছিল বলে মনে হয়।

দোতরা পালা সাধারণত সামাজিক রঙ্গব্যঙ্গ ও লৌকিক কাহিনী নির্ভর। অপরপক্ষে কুষাণ পালায় থাকে পৌরাণিক ঐতিহাসিক কাহিনী। কোচবিহারে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য দোতরা পালাগুলি হল বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী, করিম বাদশা, গুঞ্জুরা বিবি, মৈষালবন্ধু, দুবলা বলী, ময়নামতী, কালুগাজী, রূপবান কন্যা। অপরপক্ষে এতদঞ্চলে কুষাণ পালাগুলি হল - লবকুশ, দাতা হরিশচন্দ্র, রাবণ বধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, ধনপতি সওদাগর, বেহুলার ভাসান, সতী বেহুলা ইত্যাদি। কুষাণ ও দোতরা পালার মত লোকনাটকের যেমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেই তেমনি নেই কোন লিখিত রূপ। মূল বা পরিচালক সাধ্যমত কাহিনীর বিস্তার ঘটান। আসরের ওজন বা সমাগম বুঝে পালার স্থায়িত্ব বাড়ান বা কমান। বিষহরি পালাকে কুষাণের অন্তর্গত ধরা হলেও বিষহরি পালার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন এর সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসেবে মুখা বাঁশী অপরিহার্য। কুষাণ লোকনাটক যা প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ কাহিনীর নৃত্য - গীতিময় ধারা। এই কুষাণ পালা একদিন রামযাত্রা নামেও পরিচিত ছিল। কুষাণ পালায় মূলের হাতে থাকে 'বেনা' নামক একটি বাদ্যযন্ত্র। এই সুবাদে এতদঞ্চলে কুষাণ পালা নাটককে বলা হয় 'বেনা কুষাণ'। কুষাণ পালায় চার থেকে পাঁচজন ছোকরা মেয়ে সেজে নাচে আর গান গায়। যদিও বর্তমানে মেয়েরাই এই ভূমিকায় অভিনয় করে। উত্তরবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কুষাণ পালার মূল ললিত নারায়ণ কুষাণীর মতে কুষাণ পালায় এভাবে নাচ ও পালা চলতে থাকে। মূল একাধারে পরিচালকও বটে। তিনি গানের মাধ্যমে পালা গেয়ে যান। সমগ্র দর্শক মনে একঘেয়েমি দানা বাঁধতে

দেন না দোয়ারী। দোয়ারী দর্শকদের হাসান এবং কাঁদান। রামায়ণের লবকুশের গাওয়া গানের অনুকরণে সৃষ্ট বলে এই পালাগান এতদঞ্চলে কুষাণ গান হিসেবে বেশী পরিচিত। পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর গীত রচনা করে তার সঙ্গে ভাওয়াইয়ার সুরে সুরারোপ করে জনমনোরঞ্জন করাই ছিল এই পালার দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য। লোকসংস্কৃতির এই ধারায় পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীগণও পরবর্তীতে আসীন হয়েছেন।

উন্মুক্ত খোলা মাঠ, উৎসব প্রাঙ্গণ বা বড় উঠোনে বৃত্তাকার স্থানে শামিয়ানা বা কোন আচ্ছাদন দিয়ে এই পালার অভিনয় মঞ্চ তৈরী করা হয়। দর্শক বেষ্টিত উক্ত স্থানটি অভিনয় স্থল। বাদ্যযন্ত্রীরা দর্শকের সামনে বৃত্তাকারেই বসেন। মূল বা গীদাল পাশাপাশিই থাকেন। দর্শক অভিনেতার স্থানও এই নাটকে পাশাপাশিই থাকে। আলোর ভূমিকা খুবই নগন্য তবে প্রাচীন ডেলাইট বা হ্যাজাকের প্রচলন এখন আর নেই।

কুষাণ পালায় মূলের হাতে যেমন বেনা নামক বাদ্যযন্ত্র অবশ্যই থাকবে, তেমনি দোতরা পালায় মূলের হাতে থাকবে দোতরা। দোতরা পালার একটি বৈশিষ্ট্য হল দোতরা পালার কাহিনী ও সংলাপের ভাষা বলে দেয় এই নাট্যরূপ কুষাণের চেয়েও বেশী গণভিত্তিক ও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী। মধ্য যুগে এসে এই সব লৌকিক পালায় মুসলিম প্রভাব পড়েছে। যার ফলস্বরূপ কাহিনীতে দেখা যায় বৈচিত্র্য। "দোতরা বাদ্যযন্ত্রটি মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গেই যুক্ত। ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক আদি লোকনাটকের ধারা যে ভাবে দোতরা পালায় রক্ষিত হয়েছে উত্তরাঞ্চলের কোন লোকনাটকে তা দেখা যায় না।" [১৭]

তবে কুষাণ ও দোতরা পালার অপর বৈশিষ্ট্য হল অনেক সময় গানই সংলাপ, নাচই মনভাবের বাহক। শুধুমাত্র গানকে নির্ভর করেও অনেক পালা আছে। সংলাপ সবক্ষেত্রেই গদ্য ও পদ্যে রচিত। সবক্ষেত্রেই পালা শুরুর আগে আসর বন্দনার রেওয়াজ আছে। সেক্ষেত্রে সরস্বতী বন্দনাই বেশী দেখা যায়। আসর বন্দনা শেষ হলেই 'মূল' পালা ঘোষণা করেন। যেমন -

"বন্দনা কথা ভাইরে ক্ষেন্তদিয়া যাই
বেহুলা ভাসানী গান সভাতে জানাই।

কোচবিহারের প্রচলিত লোকনাটকে পালা চলাকালীন দর্শকমনের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য (Dramatic relief) 'ফাস গান' বা 'খোসা' গানের প্রচলন আছে। যদিও এ গান মূল পালার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয়, একে অনেক জায়গায় ভর্তুকি গানও বলে। এরূপ একটি ভর্তুকি গান হল -

"আমার পালঙ্কের ময়না কোন বনে যায়রে
কোন বনে যায়রে ময়না ফিরিয়া না চায়রে।"

কোচবিহারের লোকনাটকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর লোকসাংবাদিকতা। তাই এর কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে চলে আসে সামাজিক সমস্যা। এ ব্যাপারে দোয়ারীর ভূমিকা বেশী। যেমন এতদঞ্চলে প্রচলিত মৈষালবন্ধু পালায় তেভাগা আন্দোলনের প্রসঙ্গ দেখা যায়। "মন্ডল গ্রামপঞ্চায়েত নিঝালুর সঙ্গে তার কথাবার্তা হচ্ছে - মন্ডল "মন্ডল ঃ দাদা রাগ না হয় চন্ডাল, ভোগ না হয় পিচাল। কজরুর ডাহার ভিতর কি হবার ধচ্ছে ট্যার পাচেন ? বাগ বলে ৬০/৪০ । উচ্ছেদ করা চলে না। ভাগচাষ বোর্ডের আইন। উকি ফির বেনামী আর রিটার্ন দেওয়া জমির ভাগ বন্দ।" [১৮]

মৈষালবন্ধুর কাহিনী মূলত প্রেমোপাখ্যান হলেও এর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজ ব্যবস্থার নিষ্ঠুর অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কোচবিহারের গ্রাম্য পরিবেশ, অর্থবানের বহুবিবাহের নেশা, অতি সাধারণ মানুষের জীবনধারা, মৈষালের জীবন কথা, বিবাহ ব্যবস্থা, অর্থের প্রতিপত্তি ইত্যাদি নাটকের আঙ্গিকে রূপায়িত হয়েছে।

লোকনাটকের সাজসজ্জা খুবই সাধারণ। মূল বা গীদাল সাধারণত পড়েন ধুতি পাঞ্জাবি ও সাদা উত্তরীয়। তবে

বর্তমানে প্রচলিত লোকনাটকগুলিতে চরিত্রাভিনেতার আগমনে সাজসজ্জার চাকচিক্য দেখা যায়। দোয়ারী যেহেতু কমিক চরিত্র তাই তার অঙ্গ সজ্জায় থাকে তীর্যক আভাস, যেমন — তিনি নাভির নীচে কাপড় পরেন, মাথায় টিকি, চিত্রিত অঙ্গ, কপালে ও বুকে তিলক ফোঁটা, হাতে একটি ত্রিভঙ্গ লাঠি, কাঁধে গামছা। তবে কুষাণ পালায় মূলের গায়ে সবসময় থাকে নামাবলী।

উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত কুষাণ পালার মূল ললিত (বর্মন) কুষাণীর মতে 'পূর্বে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপদ সঙ্কুল থাকায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুল থাকায় পালা চলত সারারাত ধরে। দর্শক শ্রোতাগণ বাড়ী ফিরতেন ভোরের আলোয়। কিন্তু বর্তমানে কর্মব্যস্ত মানুষের সারারাত জেগে নাটক শোনার সময় নেই। তাই সময়ের পরিবর্তনে লোকনাটকের দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে এসেছে।'

কোচবিহার ও নিম্ন আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অনেক গ্রামে পালার শেষে রামায়ণের মাহাত্ম্য বর্ণনার রেওয়াজ আছে। জেলার সিতাই ব্লকের চামটা গ্রামের হুভার মেলায় উপস্থিত থেকে এরূপ মাহাত্ম্য মূলক গান আমরা শুনতে পাই। যেমন —

"যেই জন শুনিবারে করে অভিলাষ
সর্ব পাপ ঘুচে তার স্বর্গে হয় বাস
অপুত্রক শুনিলে সে পায় পুত্র বর
যে যাহা বাসনা করে পুরায় সত্বর
যেই জন রামায়ণ করিবে শ্রবণ
মৃত্যু কালে রাম নাম করে যেই জন
সশরীরে করিবে সে বৈকুণ্ঠে গমন।"
(বাঁশি গীদাল, নাগরুরহাট, তুফানগঞ্জ)

কুষাণ গানের মূল, গীদাল, দোয়ারী ও বায়েন ইত্যাদি শিল্পীগণের শিক্ষা সাধারণত গুরু পরম্পরায় হয়ে থাকে।

জেলায় প্রচলিত উল্লেখযোগ্য কুষাণ ও দোতরা পালায় উল্লেখযোগ্য কাহিনীগুলির বিশ্লেষণে দেখতে পাই দানবীর হরিশচন্দ্র পালায় মহাভারতের কাহিনী নির্ভরতা। হরিশচন্দ্রের সর্বস্ব দানের আগ্রহ, অর্থোপার্জনের চেষ্টা বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়া এবং সমস্ত বাধা দূর করে পালার মূল বিষয়বস্তু স্থান করে নেয়। যে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা হয় এই নাটকে তা হল সত্য বা আদর্শ রক্ষার জন্য স্ত্রী পুত্রের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে রাজকীয় জীবন থেকে শ্মশানের শবদাহনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। সর্বশেষে বিশ্বামিত্রের আবির্ভাবে রাজা হরিশচন্দ্রের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার কাহিনীর যে মূল্যবোধ তা আজও লোকমনে গভীরভাবে দাগ কাটে।

আবার লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালায় রামায়ণের কাহিনীর উপর নির্ভর করে রচিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুযায়ী নিকুম্ভিলার যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ নিহত হন। পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রাবণের সীতা হরণ যেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করা । কিন্তু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মন্দোদরী এই কাজে বাধা দেন। লক্ষ্মণের আরোগ্য লাভে হনুমানের আপ্রাণচেষ্টা স্থানীয় মূল বা গীদালের অভিনয় দক্ষতায় মানবতাবাদের এক চরম সত্যের প্রকাশ ঘটে। নীতি শিক্ষার পাশাপাশি লোকশিক্ষাও কোচবিহারের এই নাটক গুলিতে আমরা দেখতে পাই।

অপরপক্ষে দোতরা পালার 'দুবলা বালী' লোকনাটকের কাহিনীতে আমরা দেখি এক অল্পবয়স্ক নারী, প্রথম যখন সে জানতে পারল শ্যাম কালা তার প্রেয়সীকে না পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করেছে তখন সে এ কাজকে বোকামী বলেছে এবং সে বিশ্বাস করে, প্রেম করতে কৌশলের প্রয়োজন হয়। দুবলা তার স্বামী কর্তৃক বিপদগ্রস্ত হয়, পরে বন্ধুর সাহায্যে সে বিপদ

থেকে উদ্ধার পায়। এই নাটকের মানবমনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির লোকায়ত প্রকাশ দেখা যায়।

সতী বেহুলা পালাটি মনসামঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত হলেও এর প্রতিপাদ্য বিষয় হল মানুষের জীবন সংগ্রামে প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া এবং তাকে অতিক্রম করা। বিভিন্ন ঘটনার ঘনঘটায় পালা এখানে ক্রিয়াশীল। এই নাটকে বেহুলা লোহার কলাই জলের মতো সিদ্ধ করে দিয়ে তার সতীত্ব প্রমাণ করে। তাই দেখে চাঁদ সওদাগরের অনুচর লেংয়া তাকে বলে — "এই কইনাই ভাল হামার উত্তি কন্ট্রোলের চাইল বোল্ডারের মত। উয়ায় রান্দিলে চিন্তা নাই।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার কন্ট্রোলের অব্যবস্থার কথা এখানে বলা হয়েছে।

কোচবিহার ও পার্শ্ববর্তী নিম্ন আসামের ধুবরী ও গোয়ালপাড়া জেলার অন্যতম জনপ্রিয় পালা হল দোতরা পালার অন্তর্গত "মরুচমতী কন্যা" লোক নাটক। এর মূল কাহিনী হল — মরুচমতীকে পাবার জন্য রাজপুত্রের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হল তাকে পাবার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তারপর দেখা দিল বাধা, ফলে মরুচমতীর সঙ্গে ঘটল বিচ্ছেদ। ডোমনীকে বিয়ে করার বিষয়টি কাহিনী বলেই সম্ভব হয়েছে। লালমাছ থেকে মরুচমতীর পরিবর্তন, তারপর তার ফুল হয়ে যাওয়া, মালিনীর বাড়িতে প্রচ্ছন্ন থেকে কাজ করার মধ্যে যাদুমন্ত্র অলৌকিকতার প্রকাশ ঘটেছে।কাহিনীতে বহুঘটনায় বিবর্তন হয়েছে সত্য কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিহীন ঘটনা ঘটেছে। কাহিনী দীর্ঘ হলেও তেমন উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি।

উত্তরবঙ্গে কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি জেলার অপর একটি লোকনাটকের আঙ্গিকহল 'রঙ পাচাল' যদিও এর প্রচলন কোচবিহারের চেয়ে জলপাইগুড়িতেই বেশী। দোতরা ও কুষাণ পালার চেয়ে এর আঙ্গিক স্বতন্ত্রধর্মী হলেও দোতরা পালার মতই দৈনন্দিন জীবনের রঙ্গ রসিকতা ও হাস্যরস এরূপ পালার মূল লক্ষ্য। অভিনয়ে স্ত্রীপুরুষ উভয় চরিত্রই থাকে। লোকনাট্যের এই আঙ্গিকের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল গ্রাম্য প্রহসন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে রঙ পাচালের নায়ককে বলা হয় 'বাতেয়া'। অর্থাৎ যিনি পালার মূল কাহিনী বর্ণনা করেন। এই 'বাতেয়া' রঙ পাচাল নামক লোক নাটকের হাস্যরসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। অভিনয় চলাকালীন মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাস্যরসাত্মক সংলাপ রচনায় দক্ষ হন এরূপ চরিত্র। রঙ পাচাল অভিনয় যেমন মুক্তাঙ্গণে হয় তেমনি কোন ধরাবাঁধা নিয়মের বশবর্তী নয় এ নাটক। এতে থাকে না কোন পৌরাণিক চরিত্রের ধারা। চরিত্রে সব নামকরণ হয় লোক জীবনের অর্থাৎ লোকায়ত জীবনের চলমান চরিত্র থেকে। অর্থাৎ গ্রামের প্রধান জোতদার বা জমিদার, মুসলিমকাজী বা বিয়ের ঘটক এদের কাজকর্মকে ব্যঙ্গ করেই সংলাপের মাধ্যমে দর্শককে আনন্দ দান করা এর উদ্দেশ্য। আবার অনেক ক্ষেত্রে করুণ রসাত্মক মর্মস্পর্শী সামাজিক ঘটনাও এর বিষয়বস্তু হয়। যেমন - সৎমা, কোন পুরুষের একাধিক স্ত্রী, এদের জীবন যন্ত্রণার বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয় রঙ পাচালে। কোচবিহারে লোকনাটকের এই আঙ্গিক আজ বিলুপ্তির পথে।

আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জেলার সবকটি মহকুমার গ্রামাঞ্চলে লোকনাটক সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের সাক্ষাৎকারে জানতে পারি প্রায় সকলেই কৃষি কর্মের সঙ্গে যুক্ত। এক অর্থে কৃষি শ্রমিক। অনেকে এই লোকনাটককে পেশা হিসেবেও গ্রহণ করেছেন।

কোচবিহারের কুষাণ পালার জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান মূলদের মধ্যে অন্যতম হলেন ললিত বর্মন (ললিত কুষাণী, গোঁসানীমারী) ধরণী রায়, নৃপেন গীদাল, বীনা রায়, ভৈচাল দোয়ারী (ভান্ডিজেলাস), জলেশ্বর নমদাস,(নাটাবাড়ী) নকীন কুষাণী (হরিপুর) বাঁশি গীদাল (নাগরুর হাট)।

অপর পক্ষে দোতরা পালার মূল ও গীদালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পঞ্চাগীদাল (শিমূলবাড়ী), শিবেন মুচিয়ার ও ভোমামুচি (শিমূলবাড়ী), সুশীল রায় , কারাম মিঞা, মেঘনাদ রায়, জলেশ্বর নমদাস প্রমুখ।

জেলার বিভিন্ন গ্রামের মেলাও লোক উৎসবে উপস্থিত থেকে কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই নিদর্শনের উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা দেখতে পাই এর লোক সাংবাদিকতা। কোবিহারের লোকনাটক এক

অর্থে লোক শিক্ষক অর্থাৎ এই নাট্যমাধ্যম গণশিক্ষা বিস্তারে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। দোতরা পালার প্রেম যেমন বিশ্বজয়ী তেমনি সামাজিক সমস্যা, সাক্ষরতা, পণপ্রথা, কুসংস্কার ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে এই লোকমাধ্যমে। কুষাণ পালাও রামায়ণ নির্ভর হয়ে দক্ষ মূল ও গীদালের অভিনয় গুণে নারীর প্রেম ও সতীত্ব বড় হয়ে দেখা দেয়। সেই অর্থে কোচবিহারে লোক নাটক যথার্থই লোকশিক্ষার বাহন।

দিনহাটা মহকুমার শিমূলবাড়ী গ্রামের প্রখ্যাত দোতরা পালার মূল পঞ্চাগীদাল পরিচালিত বিশ্বকেতু - চন্দ্রাবলী পালায় আমরা দেখতে পাই রাক্ষস মেসাম্বর বিশ্বকেতুকে প্রশ্ন করে —

পৃথিবীর অধিক গুরু হয় কোন জন?
গগণ হইতে উচ্চ কোন মহাজন?
তৃণের অধিক ক্ষুদ্র কোন মহাশয়?
পবনের অগ্রেতে কে চলে যায়?

বিশ্বকেতু যথার্থই উত্তর দেয় —

পৃথিবীর অধিক গুরু হয় জননী
গগণ হইতে উচ্চ পিতা বলে মানি
তৃণের অধিক ক্ষুদ্র ভিক্ষুক যে জন
পবনের অগ্রেতে চলে আপনার মন।

এতদ্‌ঞ্চলে লোকনাটকে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত আছে প্রবাদ - প্রবচন। এগুলিও লোক শিক্ষার অঙ্গ।

চৌর্যবৃত্তিকে নিয়ে মিথ - ট্যাবু - লোককথার পাশাপাশি লোকবিশ্বাসকে ভিত্তি করে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামে 'চোর - চুরনী' নামক পালার ব্যাপক প্রচলন থাকলেও কোচবিহার জেলার একমাত্র মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ীর অনেক গ্রামে সঙ্গীত নির্ভর 'চোর - চুরনীর' পালার প্রচলন আছে। হালকা করুণ রসের মাধ্যমে লোক সমাজের প্রতিচ্ছবি এরূপ পালায় প্রতিফলিত । এই পালায় চোর ও চুরনী মূল কুশীলব হলেও অনেকক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকাও থাকে। চোর ও তার স্ত্রী চুরনীর কথোপকথনের মাধ্যমে সে কেন চুরি করতে বাধ্য হচ্ছে, চুরিকরা সামগ্রী দিয়ে চুরনীর বাসনা কিভাবে চরিতার্থ হয়, আবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ার পর তার করুণ পরিণাম প্রভৃতি কখনও গানে, কখনও কথায় ব্যক্ত হয়। মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ী অঞ্চলের এই পালার প্রচলিত একটি গানে দেখা যায় —

"চুন্নী ভাবিস না চিন্তিস্ না মোর বাদে,
ভাবিলে এ দেহা শুকাবে
কান্দিলে কি আর খণ্ডিবে
যা হবার তা হয়া গিসে
চুন্নী , মোর কপালে যা লেখা আছে।"

লোক নাটকের আঙ্গিক বিচারে এই পালা পূর্ণাঙ্গ লোকনাটক না হলেও বর্তমানে মঞ্চেও এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

চোর ও চোরের স্ত্রী উভয় ভূমিকায় অভিনয় করেন পুরুষ। কালী পূজার সময় হলদিবাড়ী ও মেখলিগঞ্জের গ্রামে যুবকগণ দলবদ্ধ ভাবে গানের পাশাপাশি একজন চোর সাজে অপর একজন পুরুষ স্ত্রীর ভূমিকায় চুরনী সাজেন। চোরের বেশভূষা স্বাভাবিক ভাবে সঙের বেশে হয়। অন্য চরিত্রাভিনেতাগণ রঙ - বে - রঙের পোশাক পরেন, অনেক ক্ষেত্রে মুখোশও

ব্যবহার করেন। গানই এই পালার সংলাপ। কখনো প্রশ্ন - উত্তরের মাধ্যমে অভিনয় সম্পাদিত হয়। গৃহস্থ যুবকগণ সানন্দ চিত্তে পালার অভিনয় ও গান শুনে তৃপ্ত হন। এই পালায় কোন ধর্মীয় বা পৌরাণিক ভাবনা নেই। গানই এই পালার কথা। চোর ও তার স্ত্রী চুরনীর নিস্তরঙ্গ জীবনে ব্যঙ্গ রসাত্মক, ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের অভিব্যক্তিপূর্ণ লোক শিক্ষা মূলক অনেক কথা থাকে এই পালায়। দিনের বেলায় ভাল মানুষ , চোর রাত্রিবেলায় কাকুরী হাতে চৌর্য কার্য সম্পাদন করেন। মেখলিগঞ্জ মহকুমার নিজতরফ গ্রামের মালতী বর্মনের কণ্ঠে একটি গানে এই করুণ দৃশ্য ব্যক্ত হয়েছে—

'ওরে মোর চুরনীটার চাতুরী
রাইতোত্ ঘুরায় কাকুরী।'

আবার হলদিবাড়ী ব্লকের হেমকুমারী গ্রামেও আমরা চোর চুরনী পালা অনুষ্ঠিত হতে দেখি।

কোচবিহারের লোকনাটকের ভাষা হল কামরূপী উপভাষা, কিন্তু তাসত্বেও কুষাণ ও দোতরা পালায় বর্তমানে প্রচলিত মান্যকথ্য ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। এটি শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে রুচিবোধের পরিবর্তন জনিত ঘটনা। বিশেষ করে এই পালা বা নাটকের সঙ্গে যুক্ত লোকশিল্পীগণ অনেকেই আজ আর নিরক্ষর নন। তাই মূল বা গিদালের শিক্ষিত রুচির প্রতিফলন ঘটে এই লোকনাটকে।

জেলার লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই লোক নাটক এখনও যাদুঘরের প্রত্ন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়নি। তাই রাসমেলা, স্নানমেলা, বাঁশপূজার মেলা প্রাঙ্গণে যেমন তেমনি শীতের মরসুমে বাঁশি গীদাল, সুশীল রায়, ললিত কুষাণীর মত দক্ষমূলগণ সিতাই থেকে মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ থেকে দিনহাটা - গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে লোকসংস্কৃতির এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে জীবন্ত ও প্রবহমান রেখেছেন। কোচবিহারের লোক জীবনকে বুঝতে হলে চলমান জীবন্ত এই গণমাধ্যম - লোকনাটকের বিচার বিশ্লেষণ - সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন।

কোচবিহারে প্রচলিত লোকনাটক সাম্প্রতিক কালে জনরুচির সপক্ষে প্রযুক্তি নির্ভর প্রচার মাধ্যম দ্বারা বিকৃত হচ্ছে। লোকনাটক তাই তার মূল আঙ্গিক থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। প্রধান অভিনেতা ও মূল(গোসানীমারী গ্রামের ললিত কুষাণী,নাগরুর হাটের বাঁশি গীদাল উভয়েই একমত যে ' পূর্বে মূল ও দোয়ারীর কথোপকথনের মাধ্যমে নাটকের মূলকাহিনী ও লোকশিক্ষার প্রকাশ ঘটত কিন্তু বর্তমানে কুশীলবরাই প্রধান।' পূর্বে অভিনয় কালে মূলের অবস্থান ছিল মাঝে, বর্তমানে আধুনিক যাত্রার অনুকরণে মূলমঞ্চের দুই পাশে গায়ক ও বাদকরা বসেন। পূর্বে লোকনাটকের প্রাণ ছিল চাপান ও বিলম্বিত লয়ের গান,বর্তমানে সবরকম লঘুচপল বিকৃত সুরের ভাওয়াইয়া গানের ব্যবহারে লোকনাটকের প্রাচীন ঐতিহ্য উপেক্ষিত।

ছড়া - ছিলকা, প্রবাদ - প্রবচন, ধাঁধাঁ, লোকায়ত মন্ত্র ইত্যাদি ঃ

ছড়া ঃ

উত্তরবঙ্গের লোক সাহিত্যের সমৃদ্ধতম অংশই হল কোচবিহারের মৌখিক সাহিত্য বা লোক সাহিত্য। যার মধ্যে ছড়া, ছিলকা, প্রবাদ - প্রবচন, ধাঁধাঁ ও লোকায়ত মন্ত্র এক বৈচিত্র্য পূর্ণ নিদর্শন। আজও কোচবিহারের নিরক্ষর, নবসাক্ষর কৃষক কবিগণের মৌখিক পরম্পরাগত হেঁয়ালী গুলির মধ্যে আমরা দেখতে পাই বিগত দিনের মানুষের হৃদয় বৃত্তি, সামাজিক রীতিনীতি, লোকাচারের বিবর্তন ইত্যাদি। আমাদের প্রকল্পাধীন সংগৃহীত ছড়া, ছিলকা,ও হেঁয়ালী গুলি কোচবিহারের কৃষক কবির নিজস্ব ভাষা ভঙ্গিতে প্রচলিত ও ব্যবহৃত। কোচবিহারেরলোক-সাহিত্যের বিষয় বস্তুর মধ্যে ছড়া গুলির এক বিশেষ ভূমিকা আছে। সভ্যতার কোন্ সময়ে এই ছড়াগুলি সৃষ্টি হয়েছিল তা কেউ বলতে পারেন না। অনেক ছড়ার মধ্যে ডাক ও খনার বচনের প্রভাব দেখা যায়। "কোচবিহারের প্রচলিত হেঁয়ালী, ছিলকা গুলির রচনা পরিপাট্য এবং অর্থ সংগোপনের কৌশল প্রশংসনীয়, পৌরাণিক আখ্যান কিংবা লোকচরিত্র অবলম্বনে ছন্দোবদ্ধ পদ্য রচনার প্রথা পুরাতন, লিখিত এবং মৌখিক এই দ্বিবিধ উপায়ই প্রচলিত হত।"[১৯] আবার এখানকার প্রচলিত হেঁয়ালী বা ধাঁধাঁ গুলি। কোচবিহারের লোকয়ত ছড়ার একটি উজ্জ্বল প্রাঙ্গণ হল এর লোক ক্রীড়া অথাৎ স্থানীয় লোক জীবনের অনেক খেলা ধূলায় ছড়ার ব্যবহার দেখা যায় ,

তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ী অঞ্চলের ভেলা পেটা গ্রামের ফুলেশ্বরী দাস আংটি খেলার একটি ছড়া আমাদের শোনান —

" আংটি না বাংটি
সরা মাছক ঘুংটি
সর সরায় না মড় মড়ায়
ডোমনা বেটা কোন্টে নুকাইল
করে কাউয়া কারটে।"

জেলার প্রচলিত শিশু ভুলানো ছড়াগুলি (ছাওয়া ভুলাকি) শুধু কোচবিহারেই সীমাবদ্ধ নয়। এমন অনেক শিশু ভুলানো ছড়াওপ্রচলিত আছে যেগুলি পার্শ্ববর্তী জলপাইগুড়ি, আসামের গোয়াল পাড়া ও বাংলাদেশের রঙপুর অঞ্চলেও সমধিক প্রচলিত।

এমন একটি শিশু ভেলানো ছড়া যার ব্যবহার দেখা যায় শিশুকে ঘুম পাড়ানোর সময়—

"আয় নিন্ (চাঁন) আয়
আমার সোনা বাচ্চা বাপই
নিন্ যাবার চায়।"

" এক শিয়ালে রান্দে বাড়ে
তিন শিয়ালে খায়
কান কাটা এক বুড়া শিয়াল
ভুড়কি মারি চায়।"
(কথক - গেন্দুশ্বরী বর্মন, গ্রাম - মাঘপালা, জেলা সদর)

তুফানগঞ্জ মহকুমার জায়গীর চিলাখানা ১নং অঞ্চলের অন্তর্গত ঝাকুয়াটারি গ্রামে অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে ধান কাটা মাড়ার পর স্থানীয় গৃহস্থ বাড়ীর যুবকগণ সোনা রায় ও রূপা রায়ের মাগন তোলা উপলক্ষ্যে গৃহস্থ বাড়ীর উঠোনে গিয়ে ছড়া কাটেন। যেমন —

" হাপ্পা হাপ্পা নাফা শাক
তাক ফেলালং পাত
হাত্তি আসিল ঘোড়া আসিল
ফুল মানিকের ভাই
ফুল মাণিকের ভাইরে
একনা উড়ালি কবুতর
উড়ি উড়ি বেড়ায় ম্যান্ডেলের ভিতর
সাত খান নাওরে সাত খানা নাওরে দরিয়া সাত
চটকার ধুতি পিন্দি বাড়ি বুলি যাই
বাড়িত নাই নাই ভাত
থুবে ..... এ ..... থুবে।" (দোহার)

এতদ্‌ঞ্চলের মৌখিক সাহিত্য লোকমনের কষ্টকল্পিত ফসল নয়। লোকজীবনই এই ফসলের উৎসভূমি। অলিখিত

এই মৌখিক সাহিত্য তাই কোচবিহারের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লিখিত সাহিত্যের ভিত্তিভূমি। দৈনন্দিন, পারিবারিক গ্রামীণ জীবনে নির্মল আনন্দ যোগায় লোকসাহিত্যের এই চলমান নিদর্শন গুলি। তাই আজও কালজানি, তোর্ষা, রায়ডাক সংলগ্ন গ্রামের নির্জন প্রান্তরে রাখালিয়া বাঁশির সুর, মইষালের দোতরার ডাং যেমন শোনা যায় তেমনি সোনারায়ের ব্রতীগণ বাড়ীর উঠানে এসে হাক ছাড়ে লোকায়ত ছড়ার ভঙ্গীতে—

"সোনারায়ের দক্ষিনা দিতে যায় করিবে হেলা
তার সোয়ামীর নাগাল পাইম গরুচড়ের বেলা
সোনারায়ের দক্ষিনা দিতে যায় করিবে ইশপিশ
ছয় মাস তার গাত জ্বর পেটে পড়িবে বিষ।"

কোচবিহারের লোকায়ত জীবনে নিরক্ষর, নবসাক্ষর, বিবাহিত রমণীগণ লোকলজ্জায় স্বামীর নাম উচ্চারণ না করে হাতে পয়সা না থাকলেও ঘাট পারাপারের সময় সে ছড়ার মাধ্যমে ঘাটিয়ালকে অনুরোধ করেন —

তিন তেরো দিয়া বারো
নয় দিয়া পূরণ কর
মোর সোয়ামীর এই নাম
পার করি দেও বাড়ি যাং
(সুবল চন্দ্র বর্মন, গ্রাম - অন্দরান ফুলবাড়ী, তুফানগঞ্জ, ৫/১২/৯৮ইং)

কোচবিহারে লোককবি বা হেটোকবিদের রচনা বিষয়বস্তুর গুণে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চোখে দেখা, চেনা জানা নানা পরিবেশে কোন সত্য ঘটনা, প্রেম - প্রণয়, অভাব - অভিযোগ এক কথায় চলমান জীবনের বাস্তব চিত্রই ফুটে ওঠে লোক কবিদের এই হেটো কবিতায়। যেমন বর্তমান সাক্ষরতার প্রচারে গ্রামগঞ্জের হাটে মাঠে লোককবির কথায় শোনা যায়—

" আছে অন্ধকার নিজের ঘরে কেহ নাহি জানে
নিরক্ষর শত্রু মোদের বুঝলাম এতদিনে
শত্রু হটাইব আলো জ্বালব কালের প্রদীপ লইয়া
নিরক্ষরকে সরা সব আলোর মুসল দিয়া।"

ছিল্কা ঃ

কোচবিহারের গ্রামাঞ্চলে সাধারণ লোক সমাজের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত হয় শ্লোক বা ছিলকা। শ্লোক শব্দের অপভ্রংশ এখানে ছিলকা বা ছিলিকা নামে প্রচলিত। তবে শ্লোক ও ছিলকার প্রয়োগ রীতি ভিন্ন । "শ্লোকের প্রয়োগ রীতিতে যে গুরুগম্ভীর এক ভাব লক্ষ্য করা যায়, ছিলকার প্রয়োগে তা দেখা যায় না। সাধারণত ছিলকার প্রয়োগ লঘু চপল, এ যেন হালকা ডিঙি নৌকা পালে বাতাস লেগে তর তর করে বয়ে চলছে।"[২০]

কোচবিহারের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের এমন কতকগুলি ছিলকা বা হেঁয়ালী প্রচলিত আছে যেগুলি প্রতি মুহূর্তে বাক্য বিনিময়ের বা কথোপকথনের মাধ্যমে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এগুলি এতদঞ্চলের লোকজীবনের নিত্যসঙ্গী। উপকারী মানুষ কতটা উপেক্ষিত তার দৃষ্টান্তের একটি ছিলকা হল — "উপকারী গাছের নাই ছাল / উপকারী মানষির নাই ভাল।" অপর একটি প্রচলিত ছিলকা হল — আগ ধেয়া যায় বান্দে আলি / তায় খায় শইল বোয়ালী। " অর্থাৎ যে তারাতাড়ি আল বাঁধবে সে ভাল ভাল মাছ পাবে। হলদিবাড়ীর হেমকুমারী গ্রামে সংগৃহীত একটি ছিলকা হল — "একে পাতে খাই / তোর ক্যানে গাও দুম দুম মোর ক্যানে নাই।" অর্থাৎ এক সাথে খাওয়া দাওয়া করে কেউ রুগ্ন থাকে আবার কেউ নাদুস নুদুস চেহারার হয়। জেলায় প্রচলিত এমন কতকগুলি প্রবাদ আছে যেগুলি সার্বজনীন, যার মধ্য থেকে উঠে আসে চিরন্তন মানব অভিজ্ঞতার

কথা। এমন একটি প্রবাদ হল —

"আটিয়া কলাক বলা না কং বিচি সাং সাং করে
পর পুরুষক পুরুষ না কং নিদান কালে ছাড়ে।"

হেঁয়ালী কোচবিহারে ছিলকা নামেও পরিচিত। অক্ষরজ্ঞানহীন কৃষক কবির সহজ সরল ভাব সমৃদ্ধ এই ছিলকাগুলি বা হেঁয়ালীগুলির মধ্যে আধুনিক সাহিত্য কৌশল না থাকলেও এর মধ্যে অতীত যুগের মানব হৃদয়ের রুচি, সামাজিক রীতি নীতি প্রচ্ছন্ন ভাবে ব্যক্ত হয়। এরূপ ছিলকা ও হেঁয়ালীগুলি শুধু মাত্র কোচবিহারেই নয় পার্শ্ববর্তী আসামের গোয়ালপাড়া জেলা, জলপাইগুড়ি ও অবিভক্ত বাংলার অনেক জেলাতেও সমধিক প্রচলিত। এতদঞ্চলের অনেক গ্রামেই বিয়ের সময় কন্যাকে পাত্রস্থ করার পূর্বে উপদেশ মূলক একটি ছিলকার প্রচলন আছে — "নদী দেখি করি স্নান / পুরুষ দেখি করি দান।" অর্থাৎ স্নান করার পূর্বে আমাদের নদীর জলের গভীরতা ও স্বচ্ছতা যেমন দেখা প্রয়োজন, তেমনি কন্যার বিয়ের সময় বরের স্বাস্থ্য, চরিত্র ও আর্থিক সঙ্গতির কথা জানা দরকার।

প্রবাদ ঃ

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত এতদঞ্চলেও প্রবাদ কোন্ মুহূর্তে সৃষ্টি হয়েছিল তা কেউ বলতে পারেন না। কালের বিবর্তনে প্রবাদ পরিবর্তিত হলেও তার অর্থ থাকে অপরিবর্তিত। অর্থ ঠিক রেখে উত্তরবঙ্গের অনেক গ্রামে অঞ্চলভেদে প্রবাদ ভিন্ন নামে প্রচলিত আছে। প্রবাদের সমাধানটাই শেষ কথা নয়। হলদিবাড়ী ব্লকের হেমকুমারী গ্রামের নন্দ কুমার বর্মনের কাছ থেকে এরূপ একটি প্রবাদ সংগ্রহ করি — "কুতিয়া মৈল দৈবকী / নাম ফাটায় যশোদারাণী" (অর্থাৎ দৈবকী প্রসববেদনা ভোগ করলেও কৃষ্ণ জননী আখ্যা পান যশোদারাণী অর্থাৎ একজন কষ্ট করে অন্যজন ফল ভোগী) জেলার সকল প্রবাদই এতদঞ্চলের স্থানীয় ভাষার এক চমৎকার নিদর্শন। প্রবাদগুলির লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল এর উপমা এবং রূপক সমূহের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য।

প্রচলিত একটি ধর্মীয় প্রবাদ হল — "যেদিন মারিবে হরি / কি করিবে ডাং ধরি।" (যেদিন হরি মারবে সেদিন ডাং ধরি তথা বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবী কেউ রক্ষা করতে পারবে না।) দৈনন্দিন জীবনের একটি সামাজিক প্রবাদ হল —

"বৈদ্যের কাশুলা মাও
কামারের ঘ্যাচকাটা দাও
ছকর বন্দের ভিজে মাধা
তাঁতীর ছাওয়ার গালাত ক্যাথা।"

(কথকঃ দেবী বর্মন, গ্রাম - শিকারপুর মাথাভাঙ্গা।)

বৈদ্য সবার রোগ সারান অথচ তার নিজের মা কাশ রোগে ভোগে, কামার সবাকার দা তৈরী করে দেন অথচ নিজের দা - এ শান দেবার সময় তার হয় না। ঘরামি পরের চাল মেরামত করে অথচ বর্ষা কালে নিজের চাল দিয়ে জল ঝরে। অন্যের বস্ত্র বুনতে বুনতে তাঁতীর সময় চলে যায়, তাঁতীর ছেলের সম্বল ছেঁড়া কাঁথা। এখানে নিজের ঘর আগে সামলানোর উপদেশ দেওয়া হয়েছে। দৈনন্দিন এক চিরন্তন সত্য ফুটে উঠেছে এই প্রবাদটিতে।

জেলার প্রায় সকল গ্রামেই প্রচলিত অপর একটি জনপ্রিয় প্রবাদ হল —

" ঝাপি মাথাত দিয়া নাও বয়
তাকে কং মুই নাইয়া
বিয়ার পরে নাইয়োর না যায়
তাকে কং মুই মাইয়া।"

(কথক ঃ পুলেন্দ্র নাথ অধিকারী, গ্রাম - সোলাডাঙ্গা, মারুগঞ্জ অঞ্চল)

প্রবাদটির মর্মার্থ হল মাথায় ঝাপি দিয়ে বর্ষণ মুখর দিনেও যে মাঝি নৌকা বায় সে-ই প্রকৃত মাঝি। অপর পক্ষে যে মেয়ে বিয়ের পর বাপের বাড়ীর মোহ কাটিয়ে স্বামীর সংসারকে আপন করে নেয়, বাপের বাড়ী কম যায়, সে-ই প্রকৃত মেয়ে।

কোচবিহারে বাঁশ কাটার বাঁধা নিষেধ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ হল —

"মঙ্গলে না মারি গাটি
শনিবারে না কাটি মাটি।"

শনি ও মঙ্গলবার যথাক্রমে বাঁশ যেমন কাটা যায় না তেমনি ঘরের কাজও করা যায় না।

ক্ষেত্র সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাই এতদঞ্চলের প্রচলিত প্রবাদগুলি হল এক ধরনের উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি। যার মধ্যে কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রভাব নেই। হিন্দু - মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এগুলি সমানভাবে প্রচলিত। যুগসীমা বা কালসীমা অতিক্রম করে এই সব প্রবাদ চিরন্তন মানব রায়কে প্রকাশ করে।

ধাঁধাঁ / হেঁয়ালী ঃ

এতদঞ্চলে ধাঁধাঁকে হেঁয়ালী বলা হয়। কোচবিহারের লোকসাহিত্যের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন এই ধাঁধাঁ। ধাঁধাঁর আবেদন সাধারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকেই প্রকাশ করে বেশী। ধাঁধাঁ সাহিত্যিক ও লৌকিক এই দুই রকম হলেও এতদঞ্চলে লৌকিক ধাঁধাঁর প্রচলন বেশী। জেলার অন্যান্য অঞ্চলের মৌখিক সাহিত্যের মত ধাঁধাঁও এতদঞ্চলের গ্রাম্য মানুষের সৃষ্টি। জলপাইগুড়ি জেলায় ধাঁধাঁকে বলা হয় "ফাক্‌রি"। ধাঁধাঁর বিষয়বস্তু যেমন মানুষ; তেমনি পশুপাখী, কীট পতঙ্গ এবং সামাজিক ও ব্যক্তি মানুষের চরিত্রও বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধাঁধাঁর ব্যবহার দেখা যায়। এতদঞ্চলের লৌকিক ধাঁধাঁগুলি উদ্দেশ্যমূলক হলেও লোকাচার ও ধর্মনিরপেক্ষ। কোচবিহারে প্রচলিত সকল ধাঁধাঁই প্রশ্নমূলক। কখনও অল্প কথায়, কখনও ছড়ার মাধ্যমে, আবার কখনও গল্পের মাধ্যমে। প্রত্যেক ধাঁধাঁর উদ্দেশ্যই হল কৌশল মূলক শব্দ চয়নের মাধ্যমে অন্যের প্রতি শব্দের প্রশ্নবান ছুঁড়ে দেওয়া। জেলার প্রায় সকল গ্রামেই প্রচলিত এরূপ একটি ধাঁধাঁ হল —

"রাজার বেটি ধুন্দল পেটি
বিন কোদালে খোড়ে মাটি।"
(উত্তর ঃ শূকর)

এই ধরনের অপর একটি ধাঁধাঁ হল—

"ওপারের কাশিয়াগুটি ঝিকির মিকির করে
কার বাপের সাধ্যি আছে কাটিয়া আনতে পারে ?"
(উত্তর ঃ আকাশের তাঁরা)

সুপারী ও তালগাছ সম্পর্কিত একটি ধাঁধাঁ হল —

"এক পায়ের হাতি
গলায় ঘুগুরা, মাথায় ছাতি।"

(উত্তর ঃ সুপারী ও তালগাছ)

কৃষি সংক্রান্ত একটি ধাঁধাঁ হল —

"চিকা চিকা ভুঁই নিকা
ছয় চৌকা তিন টিকা
(উত্তর ঃ জমিতে মই দেওয়া)

কোচবিহারে প্রচলিত লৌকিক, মৌখিক সাহিত্যের এই আঙ্গিকগুলি এতদঞ্চলের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির উপাদান সমৃদ্ধ রত্ন ভান্ডার। কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি বিকাশের জয়যাত্রা শুরু সুদূর প্রাচীন কাল থেকে হলেও কাল পরিক্রমায় গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে আজও পুষ্টিলাভ করে চলেছে এগুলি।

লোকায়ত মন্ত্র ঃ

কোচবিহারের মৌখিক সাহিত্যের স্বল্প পরিচিত এক প্রাচীন নিদর্শন হল, কোচবিহারের আঞ্চলিক লোক ভাষায় রচিত লোকায়ত মন্ত্র গুলি যা আজও প্রায় সকল গ্রামে সহজ সরল ভাবে গ্রামবাসী কর্তৃক সবার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এতদঞ্চলের লোকজীবনে মন্ত্রের উদ্ভব ও ব্যবহার সুপ্রাচীন কালের। সর্বপ্রাণবাদী কোচবিহারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের শুভ বিশ্বাস, সুগভীর শ্রদ্ধা এবং যাদুবিশ্বাস এতদঞ্চলের মন্ত্রের উদ্ভবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। দেও, দেবতা ও তন্ত্র মন্ত্রে বিশ্বাসী এতদঞ্চলের স্থানীয় সম্প্রদায় আজও অশুভ দেও অপদেবতার পূজার জন্য ওঝা - ফকিরের মাধ্যমে রোগ ব্যাধি সারাবার চেষ্টা করেন।

কোচবিহারের প্রচলিত বিশ্বাস, লোকায়ত মন্ত্রের সাহায্যেই যেমন বিভিন্ন মনোবাসনা পূরণ হয় তেমনি রোগ প্রতিরোধকারী অনেক ক্ষমতাও থাকে এসকল মন্ত্রে। মাসান, যখা - যখির পূজা ও ঝাঁড়ফুঁক, হারানো প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে স্থানীয় ওঝা ভোঙরিয়া ও গুণিনগণ এরূপ মন্ত্রের ব্যবহার করেন বেশী। লোকবিশ্বাসই অনেক মন্ত্রের অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার ও অর্থহীন শব্দের ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রগুলিকে রহস্যময় করে তোলে। তুফানগঞ্জ মহকুমার ছাটরামপুর গ্রামের কালারায়ের ধামের ভোঙরিয়া কালীচরণ বর্মন সাক্ষাৎকারে রোগী ঝাড়ার পূর্বে দৈবশক্তি সম্পন্ন সরষের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে একটি মন্ত্র শোনান। এটি প্রকৃতই মাসান পূজার মন্ত্র। মন্ত্রটি হল —

"বার চাষ দিলে গোসাই তের পাট মই
চাষের ভুই খান করিল খলধল
ক্যাল্লা দুগরা বন ফ্যালেয়া বেচিয়া
গোঁসাই বলে নারদ শুন মোর কথা
কাঠা সরিষা দে জমিনে ফ্যালেয়া।"

তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ী গ্রামের গিরিশ কবিরাজের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ১১০ বছরের প্রাচীন এক মন্ত্র পুঁথি থেকে তেলপড়া মন্ত্রটি সংগ্রহ করি। এটি বিশেষ করে স্ত্রী লোকের মইল্যা দোষ, (গর্ভনষ্ট, মৃত পুত্রের জন্ম দেওয়া) ইত্যাদি ক্ষেত্রে কবজ দেওয়ার পূর্বে শরীরকে তেল পড়া দিয়ে কবিরাজ মন্ত্রপুত করেন। মন্ত্রটি হল — "তেলির তেল পসারি চৌষট্টি জুগিনি / বয়ভাব গঙ্গা দুর্গাবন্দ মাতে মুই / ফল্যা তেল পরং আদ্যের দেবী কালিকা / চন্ডীর হাতে এই তেল পড়িয়া চক্ষে ছাতি পেটোত দিয়া ভুত পিচাস / জকা জকিনী দুষ্টা দানব হমকা চমকা শ্মশান মশাল বাও বাতাস / গোড়াজুল্লি নিসা চোরা ছাড়িয়া পালায় / মোর পল্যার তেল পরাত সিদ্ধি / গুরু ওস্তাদের পাও এই তেল পরি দিয়া / ফল্যাক রক্ষা করিলেক কামরূপের কামেক্ষা চন্ডিমাও।"

কোচবিহারের প্রচলিত লোকমন্ত্রগুলিতে আমরা দেখি প্রতিকার, প্রতিরোধ ও প্রত্যাখ্যানের শব্দচয়ন। অনেক মন্ত্রের

ব্যবহারিক গুরুত্ব না থাকলেও ছড়ার মত গুরুত্ব নিয়ে মৌখিক পরম্পরায় প্রচলিত আছে।

প্রচলিত অনেক মন্ত্র শুভ অশুভ অনেক কাজেই ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালের ওঝা ও ফকিরগণ এক একজন এক এক লোক দেবতার সাধক ছিলেন। তেমনি কোচবিহারের লৌকিক চিকিৎসায় ভোঙরিয়াগণ কালী, মনসা ও মাসানের শরণাপন্ন হন। রোগ বিশেষে জলপড়া, তাবিজ - কবজও দেন। তুফানগঞ্জ মহকুমার বালাভূত গ্রামের প্রবীণ সাপের ওঝা রসতুল্লা মিঞা সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসায় মনসার মন্ত্র গীতের ভঙ্গিতে গেয়ে থাকেন। যেমন —

"প্রথম আল্লার নাম দেই মেলান দরুদ নবী জী
বিসমিল্লা বলিয়া মুখের জবানও খুলি
ওস্তাদ পীর বদি করিলাম মস্তিস্ক উপরে
তুমি মাতা লখা দেবী বস আমার কণ্ঠতে
তুমি যদি না আস মা এই অধমের আসরে
কলঙ্ক হবে মাতো জগত মাঝারে।"

এতদঞ্চলে প্রচলিত মাথার বিষ ঝাড়ার মন্ত্রে দেখা যায় —

"উং গুরু মনে মনে গুরু মুখে মুখে বৈদ্য বাহন গুরু মোর আস্তি গুরু মোর পস্তি, চন্দ্র সূর্য ব্রহ্মণা বৈষ্ট মহশ্বের।"

দেশ বিভাগ জনিত কারণে পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু সমাজের আগমনে, শিক্ষা সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারে, যুক্তিবাদী বিজ্ঞান মনস্কতায়, আর্থ সামাজিক পরিবর্তনে কোচবিহারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ লোকায়ত মন্ত্র আজ বিলুপ্ত প্রায়। ক্ষেত্র সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাই মন্ত্রের দ্রব্যগুণ ও গোপনীয়তা নষ্ট হওয়ার ভয়ে ওঝা বা গুণীদের রক্ষণশীলতাও মন্ত্রের বিলুপ্তির অন্যতম কারণ - ফলস্বরূপ বংশ পরম্পরায় যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবও এজন্য দায়ী।

বহতা নদীর মতই কোচবিহারের গ্রামেগঞ্জে প্রবহমান লোকসংস্কৃতির অমৃতধারা, যার ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধ আঙ্গিক লোকসাহিত্য - মৌখিক সাহিত্য। কোচবিহারের ধর্মীয়, লোকায়ত সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন - লোকগীতি, লোককথা, লোকনাটক, লোক বিশ্বাস, যার অনন্য সাধারণ বৈচিত্র্য সমন্বিত আঙ্গিক বাংলা লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে উজ্জ্বল সম্পদ। কোচবিহারের লোকসাহিত্য লোকায়ত সমাজ জীবনকে আজও ঐক্যবদ্ধ ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে। তিস্তা, তোর্ষা, কালজানি, রায়ডাক, গদাধর অধ্যুষিত গ্রামগুলি আজও দারিদ্র্যতাকে সাক্ষী রেখে সনাতন প্রাচীন মূল্যবোধকে সম্বল করে প্রাচীন ঐতিহ্য লালিত লোককথাকে যেমন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে বিসর্জন দেননি তেমনি আজও বছরের বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন তিথিতে লোকউৎসবের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আসর বসান লোকনাটক ও লোকসঙ্গীতের। কোচবিহারের প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষায় রচিত, সমাজজীবন নির্ভর লোকসঙ্গীতের বিষয় বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দুইই অনন্য সাধারণ। বিশেষ করে আঙ্গিক ও পরিবেশণ রীতিতে। যেমন - ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের ভাব ও ভাষাভঙ্গি, উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে স্বতন্ত্র ধর্মী। সকল ক্ষেত্রেই এই আঞ্চলিকতার বর্ণময় প্রকাশভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়।

কোচবিহারের প্রচলিত লোকগীতি গুলির প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় ও লোকাচার বেশী থাকলেও তাৎক্ষণিক বিনোদনের বা আনুষ্ঠানিক বিনোদনের ভূমিকাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। অনেকক্ষেত্রেই দারিদ্র্যকে সঙ্গে করেই আনুষ্ঠানিক লোকগীতির শিল্পীরা ঘরামি, ক্ষেতের কাজ করেও এই চর্চাকে ধরে রেখেছেন।

সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে দেখা যায় জেলার সমাজও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বিয়ের গানগুলি জেলার আদিবাসী হিন্দু ও মুসলিম নারী সমাজের জীবন সঙ্গীও বলা যায়। ঠিক তেমনি এতদঞ্চলে প্রচলিত যাইটল, কাতি, হুদুম ও বিষহরি পূজা ব্রতের গানগুলিও লোকপরম্পরায় এতদঞ্চলের মানুষকে আজও উজ্জীবিত করে।

কোচবিহারে প্রচলিত পালাগান গুলির মধ্যে কুষাণ, রাবণ, বিষহরা, সোনারায় গানগুলি হয়ত উদ্ভব লগ্নে ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। পরবর্তীকালে বাস্তব রসসিক্ত হয়ে লোকচিত্ত বিনোদনের সামগ্রী হয়েছে। দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী মৌখিক সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে ছড়া, ছিলকা, প্রবাদ - প্রবচন গুলির মধ্যে স্থানীয় লোক জীবনের নানা প্রশ্নের, সমস্যার, বেদনার, সমাধানের উপায় খুঁজে পায় সাধারণ মানুষ। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি কোচবিহারের লোক সাহিত্যের আঙ্গিকগুলি লোকশিক্ষার যথার্থ বাহন। স্থানীয় লোককথা, ব্রতকথা, উপকথায়, সহজ সরল উপমার মাধ্যমে লোকজীবনই ব্যক্ত হয়। সকল ক্ষেত্রেই এই সব কাহিনী সাবলীল ও ছন্দোময়। প্রকৃতপক্ষে কোচবিহারের মৌখিক সাহিত্য মূলত লোক জীবনেরই প্রকাশ। জীবন ও জীবিকার স্বার্থে আর্থ সামাজিক কর্মকান্ডকে কেন্দ্র করে এতদঞ্চলের সমাজ জীবনের পরম্পরা ও অভিজ্ঞতার বাস্তব ভূমিতে সৃষ্টি হয়েছে লোকবিশ্বাস ও মৌখিক সাহিত্য। কোচবিহার জেলা আজও যথার্থই লোকসাহিত্যের অফুরন্ত ভান্ডার, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সমাজ বিকাশের ধারায় এরূপ লোকসাহিত্যকে মূল্য না দিলে সামাজিক প্রগতি সাধিত হবে না।

তথ্য সূত্র ঃ

১। কোচবিহার রাজ্যের লোকসংস্কৃতির আর্থসামাজিক স্বরূপ — সুবোধ সেন (Sovenir, Cooch Behar College, 1996) পৃ - গ/৮

২। ভাওয়াইয়া লোক সঙ্গীত — ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার (মনীষী পঞ্চানন বর্মার ১৩৩ তম জন্ম জয়ন্তী উৎসব ও দশম রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা। তাং - ১৪/১৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৯), কোচবিহার রাসমেলা ময়দান

৩। ভাওয়াইয়া লোক সঙ্গীত — ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার (মনীষী পঞ্চানন বর্মার ১৩৩ তম জন্ম জয়ন্তী উৎসব ও দশম রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা। তাং - ১৪/১৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৯), কোচবিহার রাসমেলা ময়দান

৪। Linguistic survey of India by G.A. Grierson. Indo - Aryan Family - Eastern group, Part - 1. First ed. 1903, Reprint - 1968, Page 193, 185

৫। ভাওয়াইয়া লোক সঙ্গীত — ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার (মনীষী পঞ্চানন বর্মার ১৩৩ তম জন্ম জয়ন্তী উৎসব ও দশম রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা। তাং - ১৪/১৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৯), কোচবিহার রাসমেলা ময়দান

৬। উত্তরবাংলার পল্লীগীতি (ভাওয়াইয়া খন্ড) হরিশ্চচন্দ্র পাল সম্পাদিত, ভূমিকা - আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ - ঝ, ঙ

৭। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — মোবারক হোসেন ব্যাপারী , বক্সীর কুঠি, তুফানগঞ্জ, কালজানি নৌকাবাইচ অনুষ্ঠান, তাং - ১১/১০/২০০০

৮। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — সিরাজুল ব্যাপারী, নৌকাবাইচ অনুষ্ঠান, ভেলাকোপা গ্রাম, চিলাখানা ২ নং গ্রামপঞ্চায়েত

৯। বাংলার লোকসংস্কৃতি - ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, বাংলা একাডেমি ঢাকা, পৃ - ১০৯ (১৯৭৪)

১০। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — ধনঞ্জয় রাভা ও তার সম্প্রদায়, গ্রাম - ভারেয়া, তুফানগঞ্জ, তাং - ৮/১১/৯৮ ইং

১১। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — মালতি বর্মন, গ্রাম - নিজতরফ, মেখলিগঞ্জ, তাং ৭/১০/১৯৯৯

১২। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — কেতুমন বিবি, গ্রাম - দেওচড়াই, তুফানগঞ্জ, তাং - ১২/৩/৯৯ ইং

১৩। কৃষক সংগ্রামের প্রতিবাদী কবি রতিরামদাস — পরিতোষ দত্ত, পৃ - ৩১, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা (১৯৯৮)

১৪। পশ্চিম দিনাজপুরের লোকনাট্য — একটি সমীক্ষা, ডঃ দুলাল চৌধুরী (মধুপর্ণী পশ্চিমদিনাজপুর জেলা সংখ্যা - পৃ- ৪৪৪ (১৩৯৯)

১৫। বাংলার লোকসংস্কৃতি — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ - ১২৯ (১৯৮২) বাংলা লোকসংস্কৃতি গ্রন্থাবলী

১৬। লোকনাটক ও উত্তরবঙ্গের জনজীবন (অপ্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ) — ডঃ সুবোধ চন্দ সেন, পৃ - ২০ (২০০০)

১৭। কোচবিহারের লোকনাটক — ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার, পৃ - ৯ (১৪০৩)

১৮। কোচবিহারের লোকনাটক — ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার, পৃ - ১৩ (১৪০৩)

১৯। কোচবিহারের ইতিহাস) — খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ - ৫২ (১৯৩৬)

২০। উত্তর বাংলার রাজবংশী ভাষায় ছিলকা — মধুরেশ চক্রবর্তী, ত্রিবৃত্ত, ১৫ ই কার্তিক (১৩৮০) পৃ - ১৭, ৫ম বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা